চিত্রালী

মুহম্মদ আমিন চৌধুরী

চ খি জাদুঘর আর্কাইভস
-১৫৪৩-

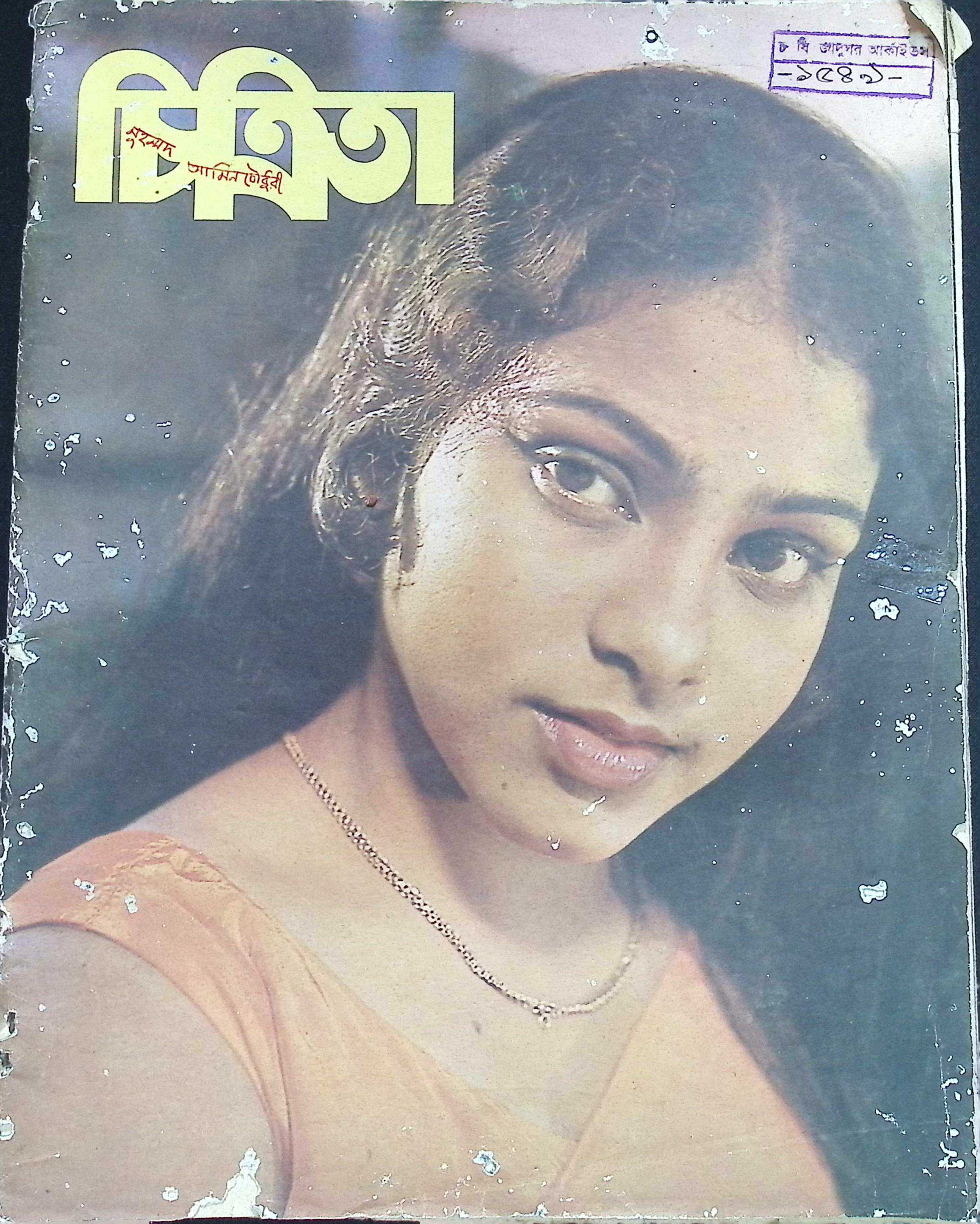

শাহানা

চিত্রময় মাসিক পত্রিকা

চিত্রিতা

৮

ফাল্গুন ১৩৭৭ সন

প্রচ্ছদের ছবি/চিত্রাভিনেত্রী সুলতানা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়/৫, বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশ/৬, জয়নুলের ছবি/৮, বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশ (দুই)/১০, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম/১৬, অলিভিয়া/১৪, কার্টুন (রনবী)/১৮, আমি (কবিতা) সৈয়দ শামসুল হক/১৯, কাফনের স্বপ্ন (গল্প) বুলবন ওসমান/২০, আলতাফ মাহমুদ (পরিচিতি) ২৩/, একুশের অন্যদিক/২৩, 'আমি কোনোদিন শহীদ মিনারে যাইনি'/২৪, আন্তর্জাতিক/২৭, বঙ্গবন্দনা (কবিতা) ফজল শাহাবুদ্দীন/২৯, শেখ মুজিব (রঙীন ছবি)/৩০, নগর বলয়/৩২, প্রশ্নোত্তর/৩২, তৃতীয় নয়ন/৩৩, প্লেবয় নয়, প্লেমেন/৩৫, জিনা বনাম সোফিয়া/৩৬, স্ক্যাণ্ডাল ইতালিয়ান ষ্টাইল/৩৯, মীনু রহমান/৪০, ভারতীয় ছবি/৪২, অবশিষ্ট/৪৪, রূপছন্দা/৪৬, অন্তরঙ্গ ষ্টুডিও/৪৮, চিত্রিতা সাক্ষাৎকার (মুনীর চৌধুরী, আশরাফ সিদ্দিকী, কবির চৌধুরী) /৫২, টেলিভিশন/৫৫।

এই পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত সাম্প্রতিক আন্দোলনের উপর অঙ্কিত স্কেচটি চিত্রিতার জন্যে এঁকেছেন শিল্পী মূর্তজা বশীর

সম্পাদক/লায়লা সামাদ
সহকারী সম্পাদক/শাহাদত চৌধুরী
নিজস্ব প্রতিনিধি/মাহফুজউল্লাহ, চিন্ময় মুৎসুদ্দী, সম্পাদনায় সহকারী/শেখ আবদুর রহমান, অঙ্গসজ্জা/রফিকুন নবী, মেসবাহ, আলোকচিত্রশিল্পী/এম, এম ইকরামউল্লাহ, কর্মাধ্যক্ষ/শফিউর রহমান

প্রকাশক/হারুণ রশীদ
করাচি প্রতিনিধি/ইকবাল আহমদ খান, নজরুল ইসলাম রোড, পিইসিএইস, করাচি। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি/জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, ১৩৩২ ডবলিউ এলেগেনি এভিনিউ, ফিলাডেলফিয়া, পিএ ১৯৩২, ইউ, এস, এ। ইউরোপীয় কার্যালয়/শিরিন জামাব, ১৫২ গ্রোভ রোড, হন্স লো, মিডলেক্স, ইংল্যাণ্ড

প্রধান কার্যালয় ৬৮/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২ ফোন : ২৫৩৫৪৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

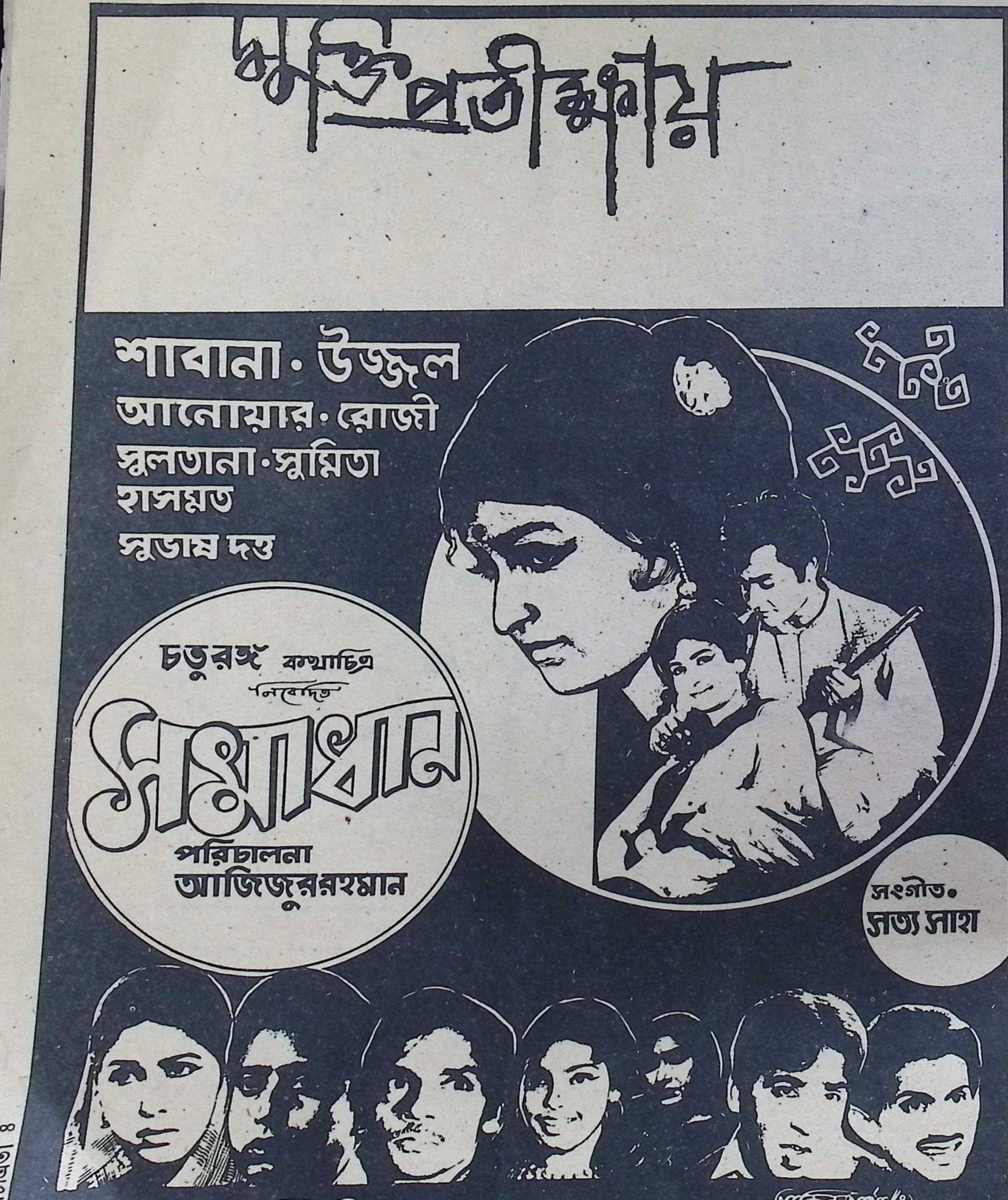
মুক্তি প্রতীক্ষায়
শাবানা • উজ্জ্বল
আনোয়ার • রোজী
সুলতানা • সুস্মিতা
হাসমত
সুভাষ দত্ত
চতুরঙ্গ কথাচিত্র
নিবেদিত
সমাধান
পরিচালনা
আজিজুর রহমান
সংগীত •
সত্য সাহা
পরিবেশনায় ॥ চিত্রবাণী

চিত্রিতা

প্রথম বর্ষ ঃ অষ্টম সংখ্যা ঃ ফাল্গুন, ১৩৭৭ সন
ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৯৭১

দশই মার্চ্চ উনিশশো একাত্তর সাল। সংগ্রাম আজ বাঙালীর নিত্যকার সঙ্গী। বুলেটের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বেয়নেটের আঘাতে রক্ত ঝরাতে ঝরাতে বাংলা দেশের মানুষ আজ এক অনমণীয় ইস্পাতের ফলায় পরিণত হয়েছে। স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোনো পথ আজ আর তাদের জন্যে খোলা নেই। বাংলার মানুষ আজ একটিমাত্র সত্তায় পরিণত হয়ে সেই মুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে অধীর যার জন্য বাঙালীর রক্তে লালে লাল হয়েছে বাঙলীরই রাজপথ শহর বন্দর আর শহরতলী। গত সাতই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স মাঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছেন তার পেছনে বাঙালী আজ রুদ্ধশ্বাস প্রস্তুত। রেসকোর্সের ঘোষণাঃ 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'-কে বাঙালী আজ যে কোনো মূল্যে পরিনতির সমে নিয়ে যাবেই। কোনো বেয়নেট বুলেটের ভয় আর তাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। বাঙালী শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন করছে—কিন্তু যদি রক্তের আরো প্রয়োজন হয় সে রক্ত ঢালতেও তারা পেছপা হবেনা।

সম্পাদকীয়

Maurice Dey
24.3.71

যে প্রতিরোধ সংগ্রাম হয়েছে ফরাসী বিপ্লবের সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। পূর্ব বাংলার প্রতিটি মানুষ আজ সংগ্রামী সৈনিক—বাংলার প্রতিটি গৃহ আজ প্রতিরোধের দুর্গ। ক্রন্দসী বাঙলার মা উৎসর্গ করেছেন তার সন্তানকে। পথে পথে আজ জনতার মিছিলে শুধু মুক্তির শ্লোগান। মুক্তি পাগল মানুষের সংগ্রামকে বিভ্রান্ত করবার জন্য পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে। দাবার মন্ত্রীর মতো ইয়াহিয়া খান এবার একলা চলো নীতি গ্রহণ করেছেন। জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগুরু দলের সাথে অধিবেশনের তারিখ সম্পর্কে আলোচনা করবার প্রয়োজন পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করেননি। কিন্তু শহীদের তপ্ত খুন যখন শুকায়নি তখন বন্দুকের মুখে অধিবেশন আহ্বান সরকারের গণতান্ত্রিকতার মনোভাবকে উপহাস করছে। সাতই মার্চে রেসকোর্সে শেখ মুজিবর রহমান একথাই ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত তার চারদফা দাবী পুরণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অধিবেশনে যোগদান করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বলেছেন নিহত ব্যক্তিদের হত্যার কারণ অনুসন্ধান ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দানের জন্য তদন্ত কমিশন গঠিত হলে, সামরিক বাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হলে, সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করা হলে ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলেই তিনি বিবেচনা করে দেখবেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করা যায় কিনা।

একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে এ দাবীগুলো মেনে নেয়া সরকারের পক্ষে কোনমতেই কষ্টকর ব্যাপার নয়। মওলানা ভাসানী পল্টনে যে কথা ঘোষণা করেছেন সেভাবেই ইয়াহিয়া সরকারের উচিত শান্তিপূর্ণ উপায়ে এসব দাবীর যৌক্তিকতা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ক্ষমতা দখলের পর থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষ পর্যায়ে এসে বাধ সেধে যে গর্হিত অপরাধ তিনি করেছেন তাতে পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্ব তার। এ সব দাবী যদি অযৌক্তিক হতো তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই এগুলো সমর্থন করতেন না। তাই ভুট্টোর উচিত তার শুভবুদ্ধির বিকাশ ঘটানো। ভুট্টোর ভয় করার কারণ নেই। পূর্ব বাঙলার মানুষ তার ন্যায্য সম্পত্তির অংশীদার হবেনা।

এসব দাবী মেনে না নিলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য তারাই দায়ী হবেন! তারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছেন এর পরিণতি কি হবে? পূর্ব বাঙলার মানুষ প্রমাণ করেছে একটু গোলমাল করতে গেলেই তাদের সোনার সংসার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সরকার এ দাবী মানতে অস্বীকার করলে শেখ মুজিবর রহমানের কাছে মুক্তি সংগ্রাম ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা থাকবে না। পরিস্থিতি তখন তাকে বাধ্য করবে ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করতে।

পরিস্থিতি আজ যে পর্যায়ে এসেছে তাতে আর অধিক রক্তপাত ঘটানোর চেষ্টা না করে ইয়াহিয়ার উচিত শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ বেছে নেয়া। জনাব ভুট্টো হ্যামলেট হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন হ্যামলেটের সেই উক্তি: "হোরাশিও, এ স্বর্গ ও মর্ত্যে এমন অনেক কিছুই আছে, যা তুমি কল্পনা করতে পারোনা।" (স্না. উ. ১৫/৩/৭১)

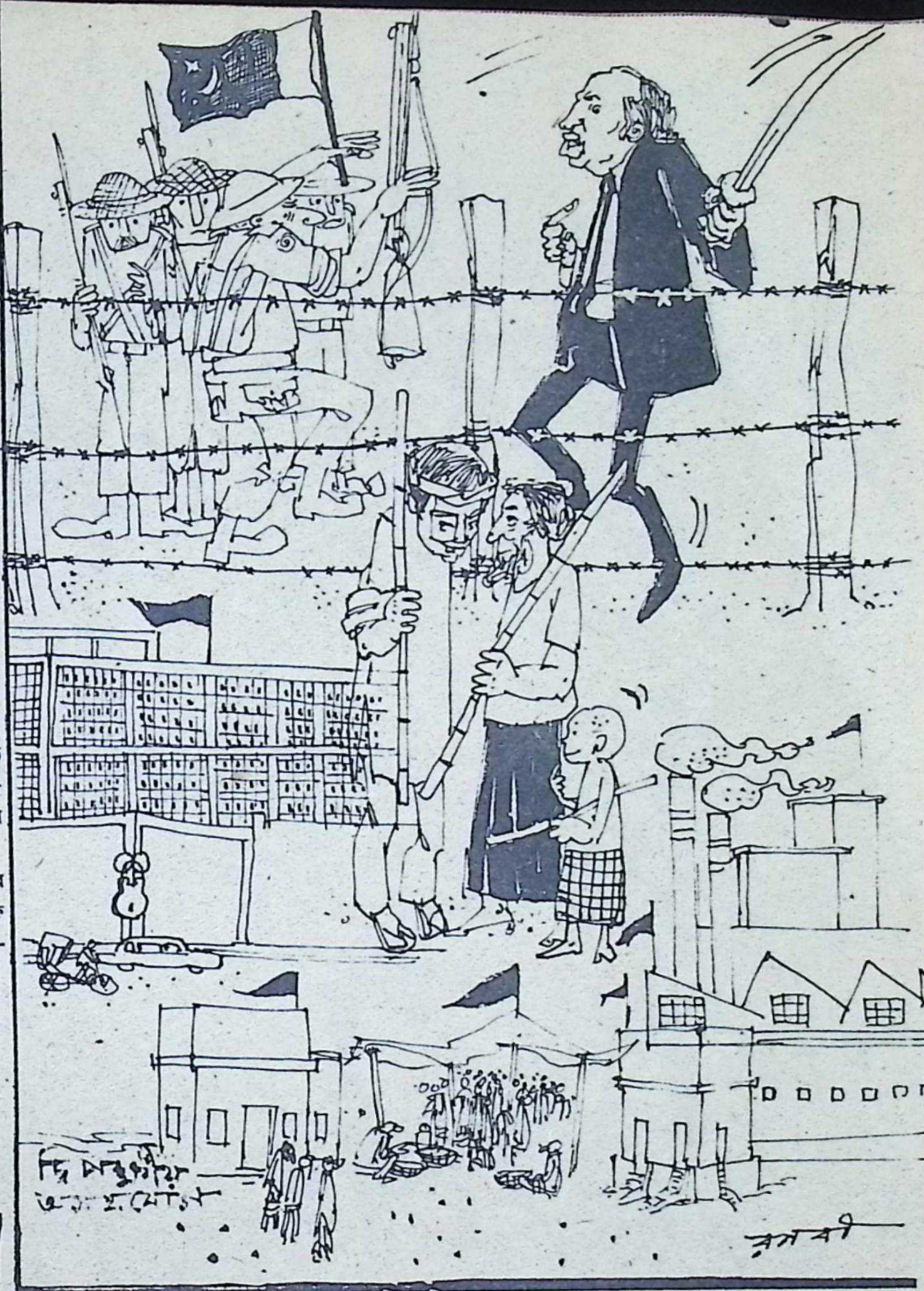

'হোরেশিও, স্বর্গে মর্তে এমন অনেক কিছু ঘটে যা তুমি কল্পনা করতেও পারোনা'

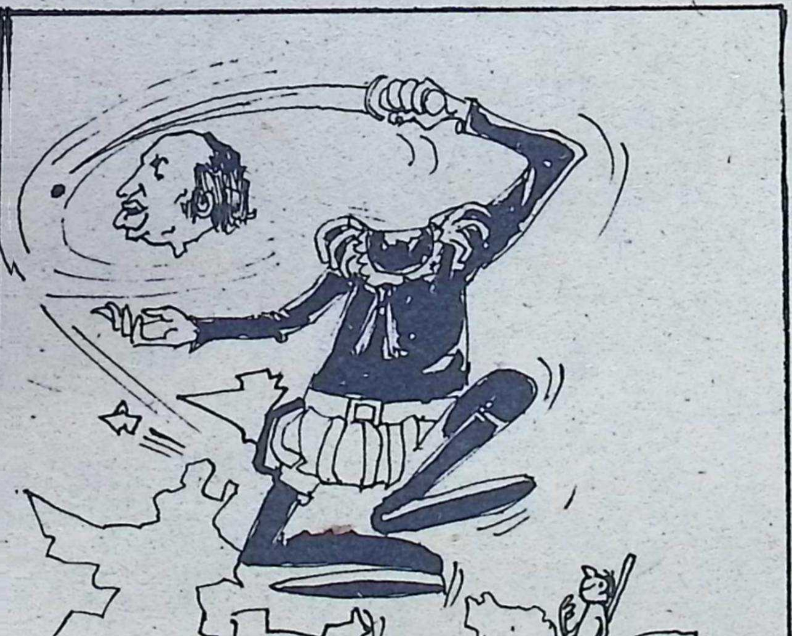

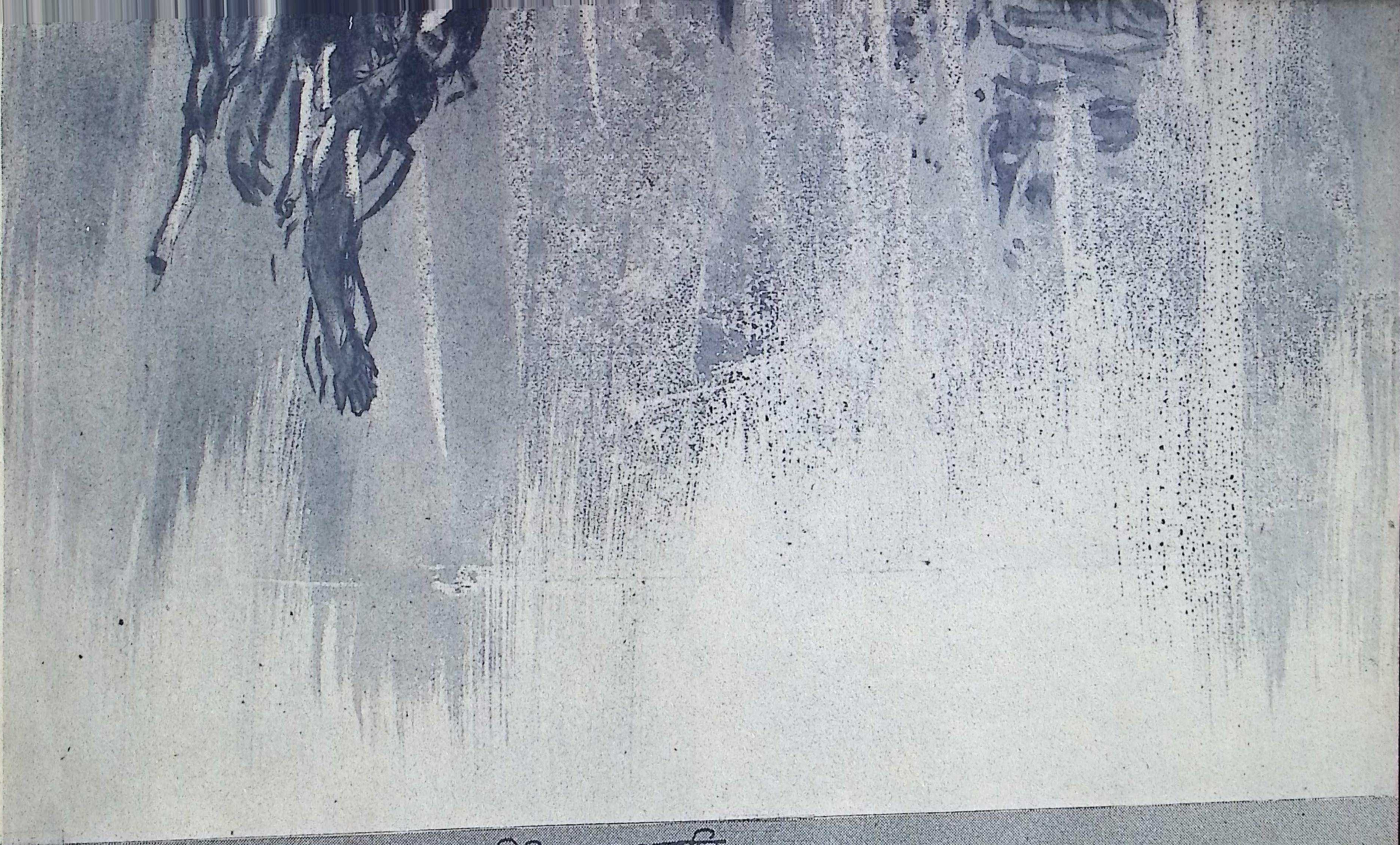

সে রাতে কারফিউ ছিলো: শিল্পী জয়নুল আবেদিন

“শাণিত তীক্ষ্ণ সাত কোটি হাতিয়া

প্রতিরোধে দুরন্ত প্রতিজ্ঞা আলোয়

বাংলাদেশ হঠাৎ করে থমকে দাঁড়িয়েছিলো সেদিন, পয়লা মার্চে। প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার আকস্মিক ঘোষণাকে বাংলার নির্যাতিত গণতান্ত্রিক মানুষ তাদের শান্তিপূর্ণ অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এক প্রতারণাপূর্ণ ছুরিকাঘাত বলে বিবেচনা করেছে। তাই শাসকগোষ্ঠীর সকল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সকল বেয়নেট বুলেটকে উপেক্ষা করে কারফিউ ভেঙে সেদিন বাঙলার মানুষ বেরিয়ে পড়লেন রাজপথে নগরে বন্দরে বুকের রক্ত ঢেলে গ্রথিত করলেন বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক বুনিয়াদ। ফারুক ইকবাল, মামুন, সোনামিয়া আর চারুবালার মতোন অসংখ্য বাঙালীর রক্তে রঞ্জিত হল বাংলার মাটি আর বাংলাদেশের মানুষের অসংখ্য হৃদয়। বঞ্চিত নিপীড়িত ক্ষুধার্ত বাঙালী এক অনমনীয় দৃঢ়তায় উঠে দাঁড়ালো। বাঙলার কবি শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিক কৃষক শ্রমিক মজুর ছাত্র কেরানী ডাক্তার উকিল সরকারী ক

বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা নে

মাঠে পথে। বাংলা দেশের র

সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক

প্রতিষ্ঠার জন্যে বাংলার মানুষ

তুলে নেয়ার সংকল্প ঘোষণা

মুজিব এলেন পল্টনের জনসমুদ্রে

করলেন বাংলার মানুষ তাদের

সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। স্বৈরা

রিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফি

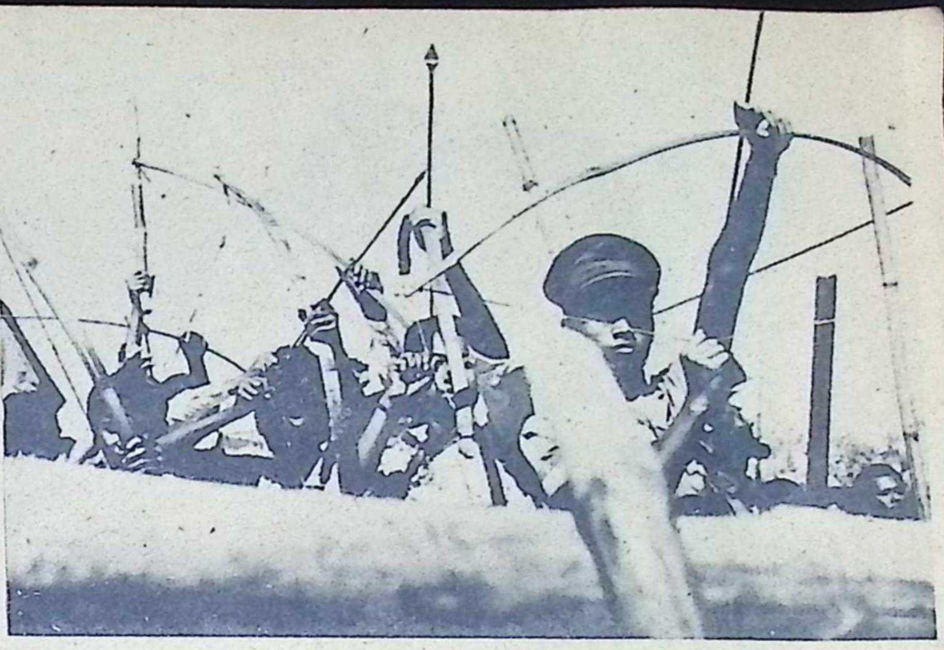

"আর নয়, শত্রুর লাশ চাই"

ইতিমধ্যে গোলটেবিল বৈঠক ডাকলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। বাংলার অধিকারকে বানচাল করবার নতুন ষড়যন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করলেন বাঙালী নেতা। এবার আর স্থির থাকতে পারলেন না কায়েমী শোষকগোষ্ঠী। প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে এক অপমানকর ধমক পাঠানো হল রক্তভেজা বাংলাদেশে। বাঙালীর সকল ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়লো। সাত তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জমায়েত হোন সারা বাংলাদেশ। এক রুদ্ধশ্বাস প্রস্তুতি নিয়ে বাংলার মানুষ এক বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়ে আরো রক্ত আরো প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার অঙ্গীকার ঘোষণা করলো। শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন তিনি পরিষদে যাবেননা—বাংলার মানুষের রক্তভেজা পথ মাড়িয়ে পরিষদে যেতে তিনি পারেন না। ঘোষণা করলেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বাঙলার সকল মানুষ আজ স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এক বিস্ময়কর ঐক্যে যূথবদ্ধ। বাংলার শিল্পীরা আজ যূথবদ্ধ হয়ে আন্দোলন এবং ত্যাগের অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন। বাংলার কবি সাহি-

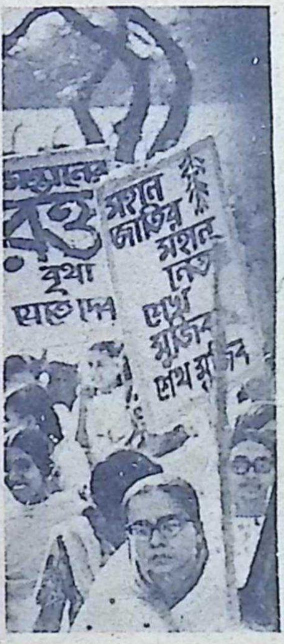

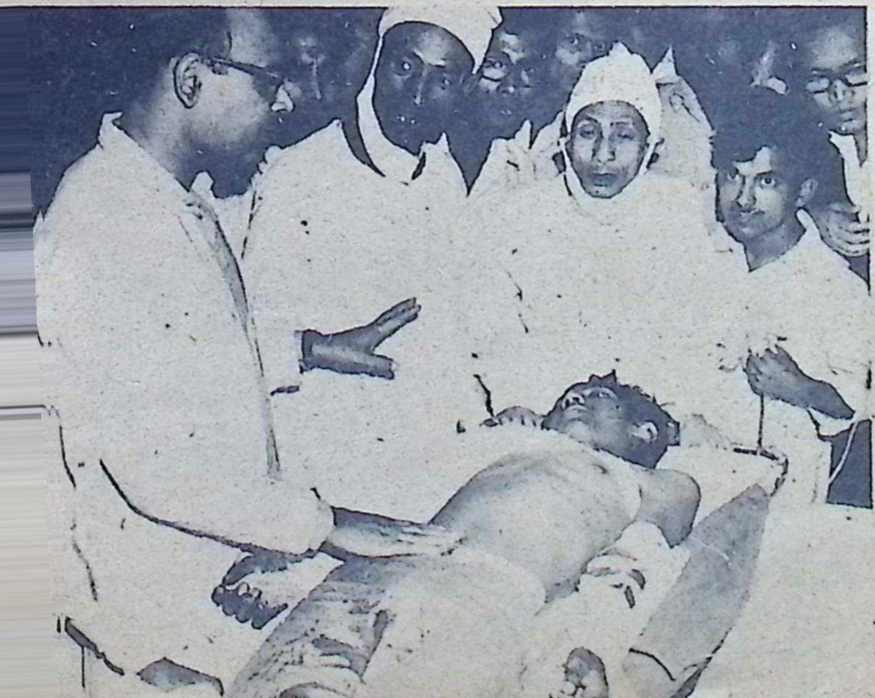

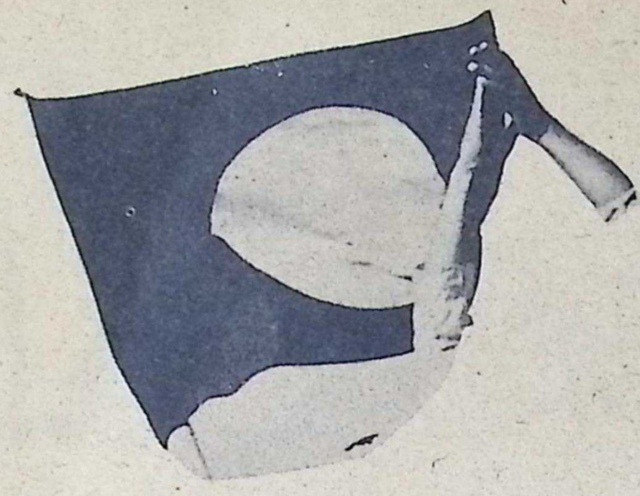

'আমার পতাকা আমার মায়ের মুখ'

তিকরা শিবির প্রতিষ্ঠা করেছেন সংগ্রামের জন্যে—শিল্পীরা, পটুয়ারা, মহিলারা এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবিরাও আজ সাধারণ মানুষের সঙ্গে এক সারিতে এসে দাঁড়িয়েছেন—ঘোষণা করেছেন পূর্ণ সংগ্রামের কথা। বঙ্গবন্ধুর নির্দ্দেশে আজ বাংলাদেশের সকল সরকারী অফিস আদালত সেক্রেটারিয়েট বন্ধ। সংবাদপত্র বেতার টিভি কাজ করছে দেশনেতার নির্দ্দেশে।

বাংলাদেশ আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে উপনীত হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের চিরবন্ধুর পথে আজ বাঙালীর কাফেলা। এ অভিযাত্রিক দল তার লক্ষ্যে পৌঁছুবেই।

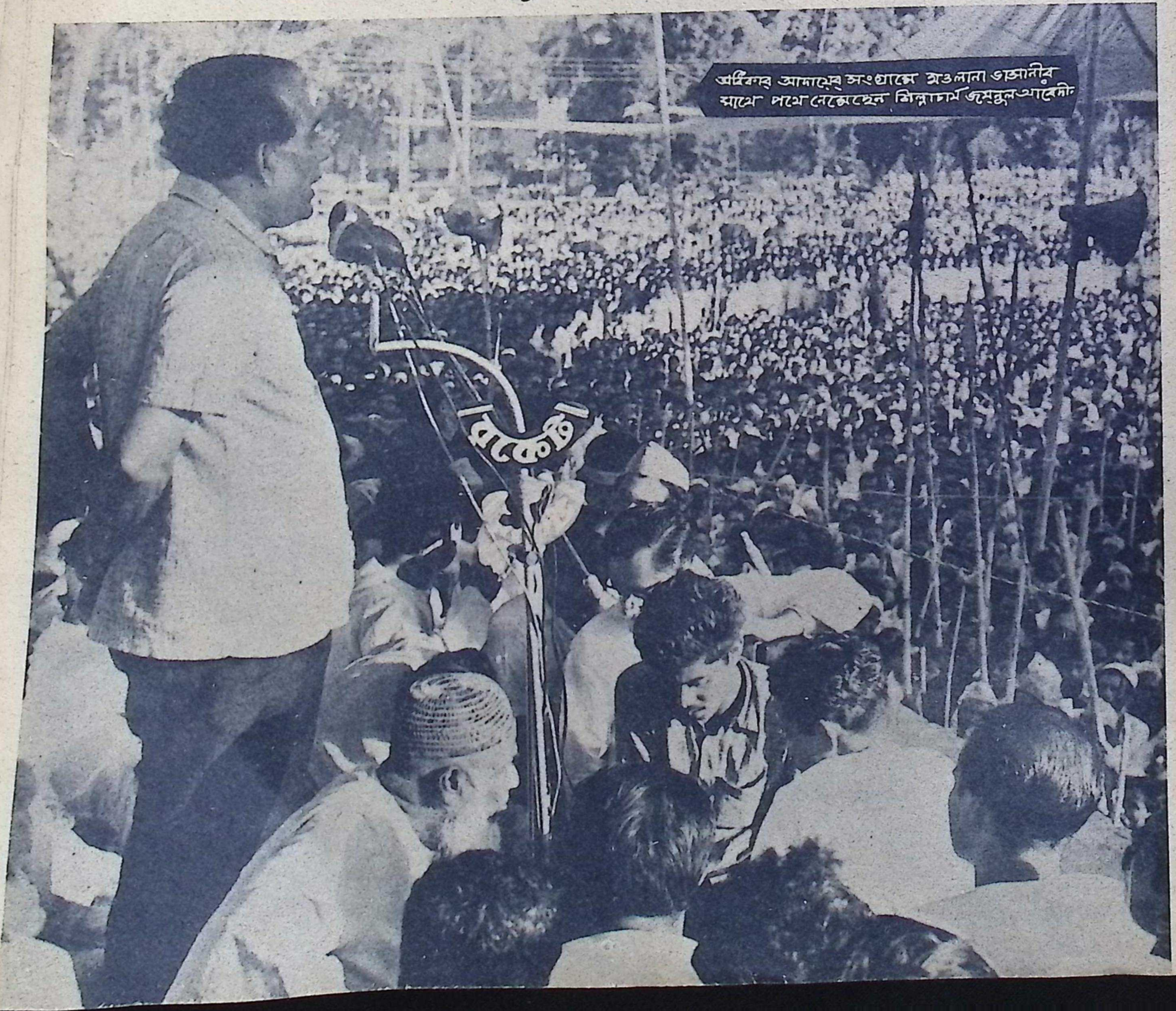

অধিকার আদায়ের সংগ্রামে মওলানা ভাসানীর সাথে পথে নেমেছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন

‘বারবার ফিরে আসে রক্তাপ্লুত শার্ট’

লেখক সংগ্রাম শিবির

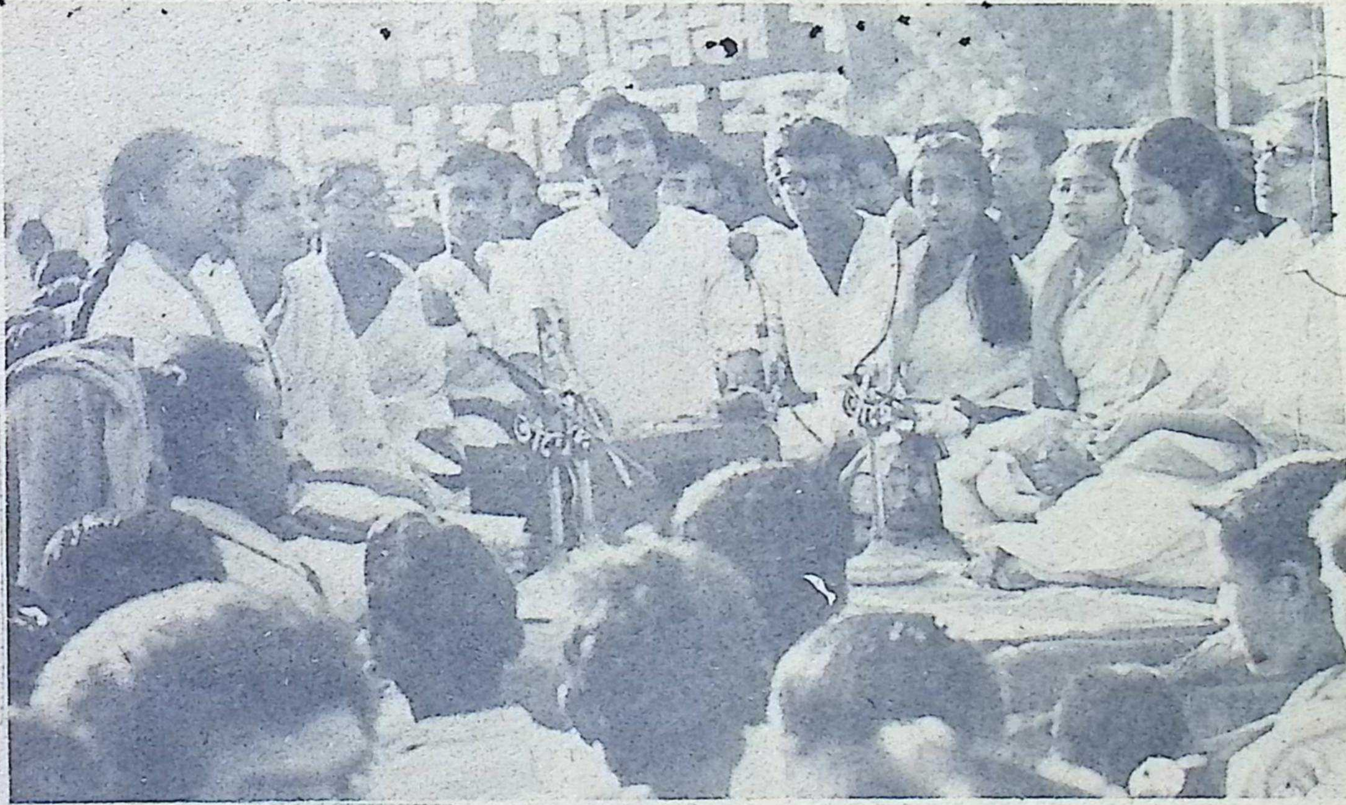

‘এপমুর’ গণসংগীতের আসর

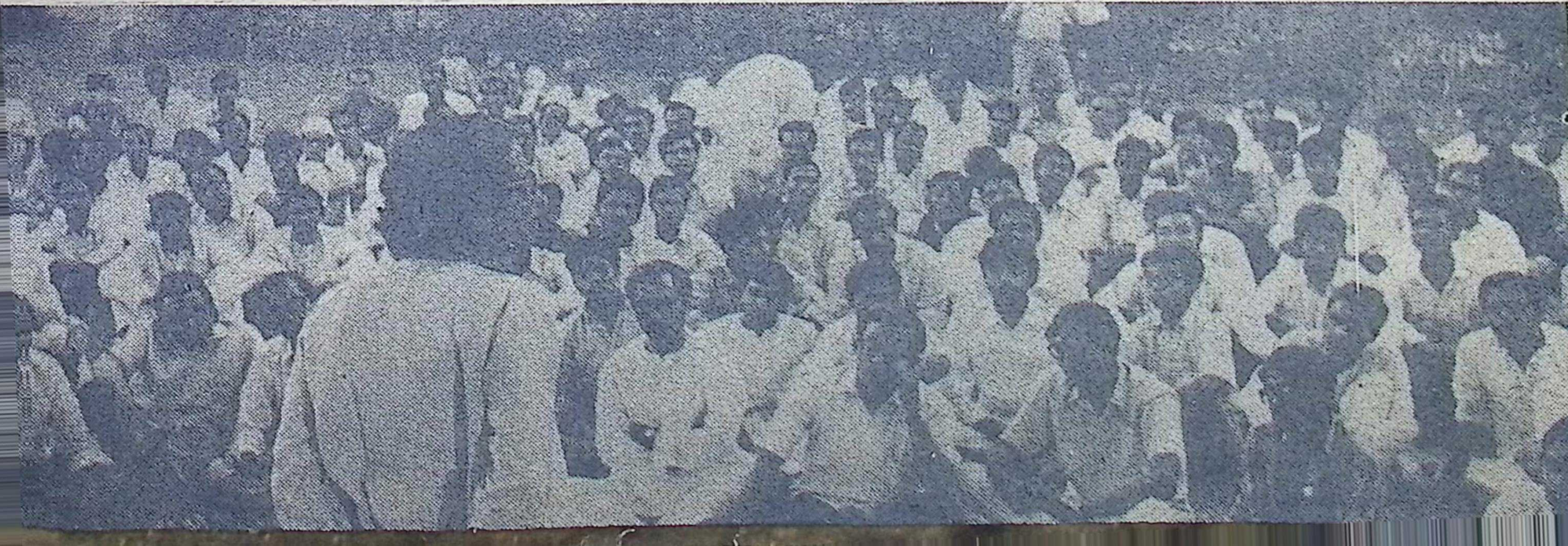

অলিভিয়া

আমি মনে প্রাণে বাঙালী, বলে হাসলেন অলিভিয়া

পর্তুগীজ বংশের মেয়ে। জন্ম করাচীতে। ঢাকায় আছেন সাত বছর। বাংলা পড়তে পারেন না। বলতে পারেন কোনরকমে। কিন্তু অভিনয় করছেন চারটে বাংলা ছবিতে: সংগীতা, শপথ নিলাম, দীপান্বিতা, কত আশা নিয়ে। অধ্যবসায়ী মেয়ে। বাংলা আয়ত্বে আনার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন।

এ মেয়ের নাম অলিভিয়া

ঢাকা চলচ্চিত্রজগতের একজন নতুন নায়িকা। যাকে প্রথমে জহির রায়হান লেট দেয়ার বি লাইট এর 'ইভা' ছবিতে মনোনীত করেছিলেন। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

লেট দেয়ার বি লাইটের মহরতে প্রথম দেখেছিলাম তাকে। অনেক দিন পরে আবার যখন দেখা হলো প্রথমে চিনতে পারিনি। অনেকটা স্লিম হয়ে গেছেন। অবশ্য স্লিম হয়ে যাওয়াটা না চেনার বড় কারণ নয়। তার পোশাকের পরিবর্তন আমাকে প্রথমে হতচকিত করে দিয়েছিলো। বাঙালী ঘরের মেয়ের মত করে পরেছিলেন শাড়ী আর মাথায় খুব সাধারণ খোপা। প্রথমে চেনার উপায় নেই যে এই মেয়ে বাঙালী নন।

—আমি তো আসলে বাঙালী, অলিভিয়াও বল্লেন, মনে প্রাণে বাঙালী। বলে হাসলেন।

—বাংলা পড়তে পারেন?

—এখনও ভাল করে পারিনা, তবে নিয়মিত চেষ্টা করছি, আশা করছি মাস খানেকের মধ্যেই পেরে উঠবো, অলিভিয়া উত্তরে বাংলাতে বললেন।

—বাংলা সংলাপ বলতে কোন অসুবিধা হয়?

—মোটেই না, খুব ভাল লাগে।

—আপনি আগে কখনো অভিনয় করেছেন?

—না, নাটক-টাটক আমি তেমন করিনি।

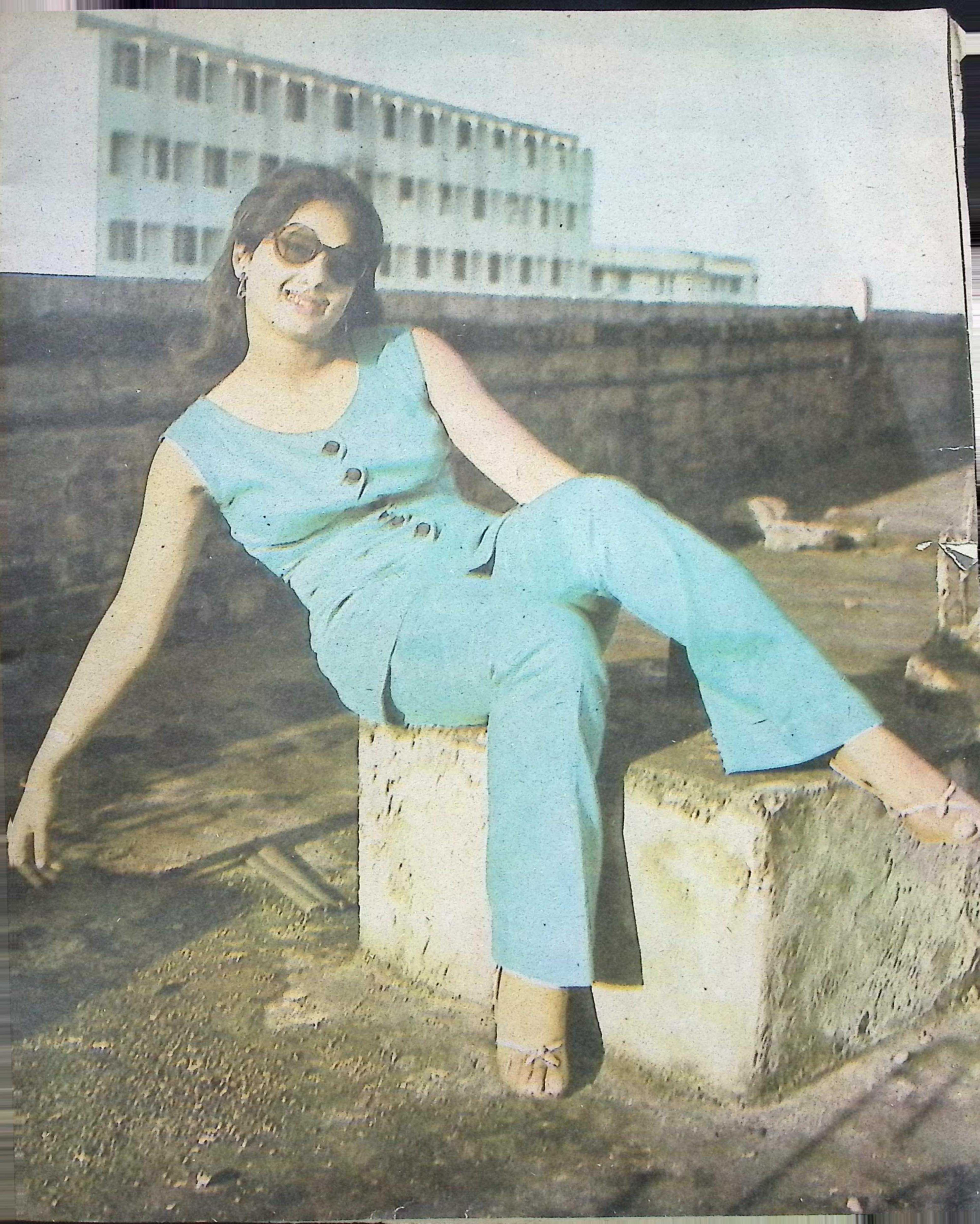

বলে একটু ভেবে হঠাৎ বললেন, ও হ্যাঁ, স্কুলে একবার একটি ইংরেজী নাটকে অভিনয় করেছিলাম। সেই প্রথম এবং শেষ।

অলিভিয়াকে ভাগ্যবতীবলতে হয়। জীবনের প্রথম ছবিতেই তিনি নায়িকা হিসেবে মনোনীতা হয়েছেন এবং কোন ছবি মুক্তি পাওয়ার আগেই তিনি চারটে ছবিতে চুক্তিবদ্ধা হয়েছেন।

—আপনি ছবিতে আসার আগে তেমন অভিনয় করেননি, এখন অভিনয় করতে গিয়ে কি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ?

—অভিনয় না করলেও অভিনয়ের প্রতি আমার স্কুল জীবনে যথেষ্ট ঝোঁকা ছিল এবং ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে আমি আমার সেই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারছি। তাই আমি এর জন্যে পরিশ্রম করছি, সাধনা করছি। আমি

অভিনয়ের মাধ্যমে আমাকে সবার কাছে পরিচিত করে তুলতে চাই। আমি সত্যিকার অভিনয় শিল্পীহতে চাই।

—আপনি ছবি দেখেন নিশ্চয়ই?

—বাংলা এবং বিদেশী সব ছবিই দেখি।

—এখানকার কোন কোন শিল্পীকে ভালো লাগে?

—রাজ্জাক, কবরী, সুচন্দা, আনোয়ার—এদের ভালো লাগে।

—ঢাকার ছবি দেখে আপনার কি কোন প্রতিক্রিয়া হয়?

—আমি মনে করছি ঢাকার ছবিতে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির অভাব খুব বেশী।

—ছবির চুম্বন-দৃশ্য সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?

—কাহিনী চুম্বন দৃশ্য দাবী করলে চুম্বন দৃশ্য নিশ্চয়ই থাকবে। ছবিতে যদি একটি দম্পতিকে দেখানো হয়, সুখী দম্পতির দৈনন্দিন জীবন তুলে ধরা হয়, তখন চুম্বন দৃশ্য নিশ্চয়ই থাকবে। নইলে তা হবে কমিক উইদআউট লাফ এর মত —যার কোন অর্থ হয় না।

—আপনি গুজবে কান দেন?

—গুজবে আমি বিচলিত হইনা। অনেক সময় গুজব শিল্পীকে জনপ্রিয় করে তোলে। হলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে প্রচুর।

একটা গুজব বেরিয়েছিল, অলিভিয়া বিয়ে করেছেন। সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে অলিভিয়া প্রতিবাদ জানালেন—না ওটা গুজব। এবং মিথ্যে। হেসে জিজ্ঞেস করলাম, শীগগীরই এধরনের কোন সম্ভাবনা আছে নাকি?

স্নিগ্ধ হাসিতে তিনি জবাব দিলেন, আপাতত এসব কথা ভাবছিনা। তবে একদিন তো জীবনসঙ্গী বেছে নিতেই হবে।

—আপনার বর্তমান পছন্দ অপছন্দ?

—না, তেমন কিছু নেই। অলিভিয়া বললেন, তবে আমার পছন্দে জাতী ধর্মের বাধা থাকবে না।

'হেথা নয়
হোথা নয়..
অন্য কোনখানে...'

আমি

আমি তোমাকে সৃষ্টি করব। কখনো আমার কাছে বর্ণ,
কখনো তা পাথর, কখ:না সুপারসনিক বিমান এই
শব্দগুলো, কিংবা সর্বক্ষণ পড়ে-পড়ে গাঢ়রস
বকযন্ত্র থেকে। অক্ষরের অবিরাম বিন্যাস যেন
সূক্ষ্ম লৌহতারে টানানো আবেগের তৈলসিক্ত
খুচরো কিছু নাট বলটু চাকা—টঙ্গীতে। আমি
বর্ণনা করব, চাঁদ যেমন বাংলার প্রান্তরকে
ধবল-শুভ্রতা করে থাকে, ঔষধ আরোগ্যকে
এবং খাদ্য তোমার জিহ্বাকে। আমার লৌহতারে
তোমার খণ্ডিত অংশগুলো।
আমি জোড়া দিলাম। লাল একটা
মোটর গাড়ী হয়ে গেল। ছেড়ে দিলাম, দৌড়ে
সে চাপা দিল, যাকে দিল সে আমি।
তাকিয়ে দেখি আমার পিষ্ট অঙ্গ থেকে বেরুচ্ছে
তোমার বর্ণ। সহাস্যে উঠে দাঁড়ালাম এবং
দয়া-ব্যবসায়ী লোকের কোলে কোলে পেঁছুলাম
শাদা হাসপাতালে। সেখানে একটা প্রাচীন
নিসর্গদৃশ্যও ছিল অসুস্থ হয়ে। মধ্যরাতে
মাঝে মাঝে অসহ্য ব্যাথায় সে চিৎকার করে
উঠতো, ব্যাথাটা ঠিক যেখানে আকাশ এসে
সবুজ শষ্যক্ষেতের সঙ্গে মিশেছে। গলা টিপে
হত্যা করতে ইচ্ছে হতো কিন্তু তখনি সে একটা
বৃক্ষের হাত বাড়িয়ে দিত আমার দিকে। সে
প্রাণত্যাগ কর:লে ওরা আমাকেও তার সঙ্গে
মর্গে নিয়ে গেল। কি অদ্ভুত ব্যবহার,
নিয়ম এবং প্রীতি! প্রতিবাদ তো দূরে
থাক, বিস্ময় আমার গেল না। রাতে
ত্রিপদী শেয়াল এসে গর্ত খুঁড়লো পচা
মাংসের লোভে, আমি সেই সুড়ঙ্গ পথে
বেরিয়ে এলাম এবং স্নান করে শুচি
হলাম নিয়মের বিভিন্ন বর্ণ জলে।
নগ্নদেহে ঘা দিলাম তোমার দরোজায়,
খুললো না; উঁকি দিলাম, দেখলাম
তুমি সুবর্ণ জন্মা একটি বলবান সিংহের
সঙ্গে রমণে রত। তোমার মুখ থেকে
অবিরাম উচ্চারিত হচ্ছে অ্যালজেব্রার
স্তোত্র। পরিনামে তোমারই গর্ভে ঠিক প্রত্যুষে
আমি জন্ম নিলাম। প্রেয়সী, জননী,
তুমি, কবিতা আমার। তোমাকে সৃষ্টি করব
এই প্রতিজ্ঞায় সর্ববস্তুর আদিতে নির্গত
আমি এবং জীবিত সর্বকালে।।

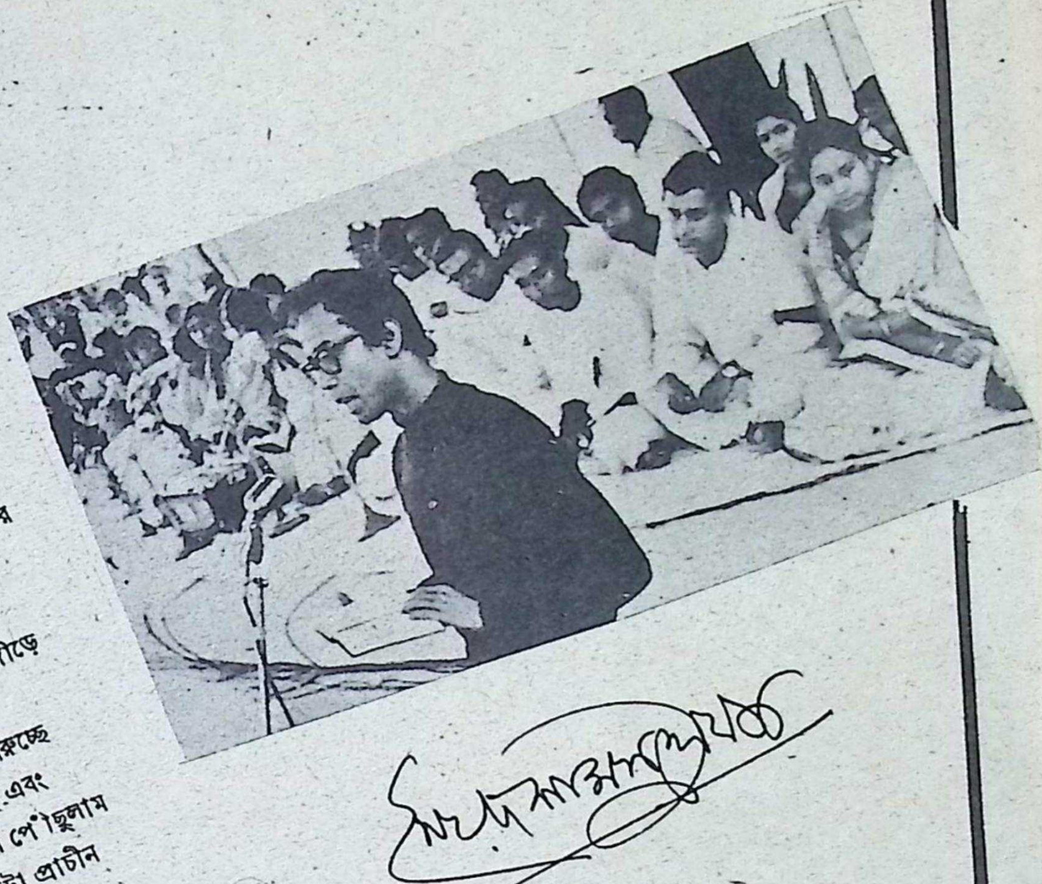

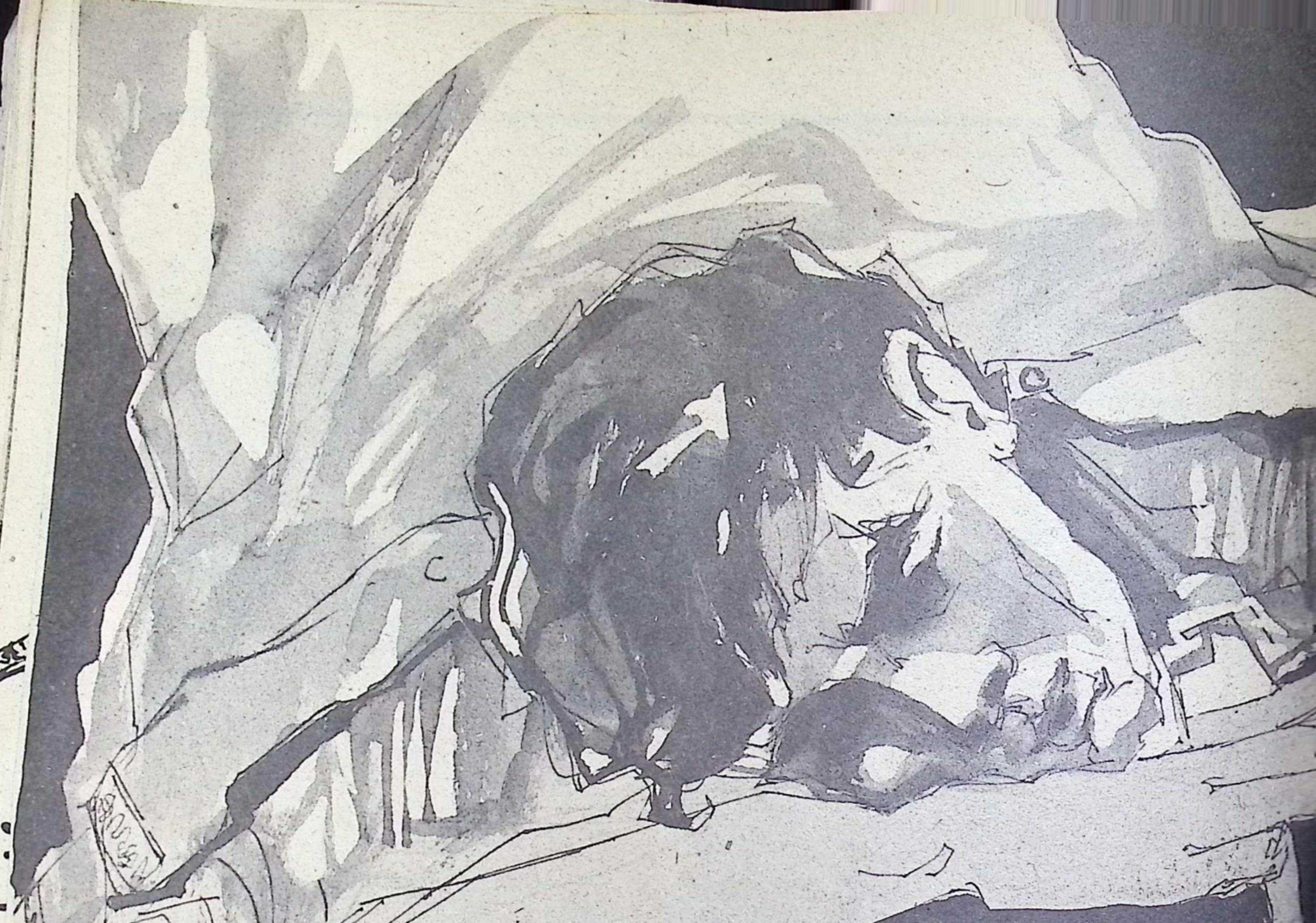

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের মিছিলটা বেরিয়ে শহরের সাধারণ জনতার সাথে মিশে যায়। এখন আর খণ্ড খণ্ড ভাব নেই, যেন পুরাতন ব্রহ্মপুত্র তার যৌবন ফিরে পেয়েছে, এই শীতেও সেখানে শ্রাবণের ঢল। আপোষ না সংগ্রাম—সংগ্রাম সংগ্রাম, পূর্ণ কণ্ঠ চীৎকারে সারা মিছিল জলোচ্ছ্বাসের মত তীব্ররূপ ধারণ করে। রাস্তার ছেলেদের চিকন গলা সব কিছুকে ছাড়িয়ে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের হুইসেলকে হার মানায়। এবার দফা, এবার দফা জনতার সংগ্রাম চলবেই, আমাদের সংগ্রাম চলবেই, আয়ুব শাহী ধ্বংস হোক.. নানা ফেষ্টুন আর পোষ্টারশোভিত মিছিলটা শীতের সকালের রোদ মেখে নতুন জীবন শক্তি ও টাউন হলের দিকে এগিয়ে চলে। ওখান থেকে ডিসির বাংলো ছুঁয়ে তারা ফিরে আসবে ষ্টেশন পর্যন্ত।

টাউন হলের সামনে পঞ্চাশ জন আনসারের এক দলকে আটকে দাঁড়িয়ে আছে, এদিকে আর এগোতে দেওয়া হবে না।

সবাই এখনকার সকালের রোদ খাওয়ার মত আলস্যে ভাবে হাতের বাঁশের লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। শুধু আনসার আলী, গায়ের রঙ যার শ্যামলা, মুখে শ্মশ্রুর হাল্কা রেখা, থেকে থেকে তার ভেতরটা কেমন করে উঠছিল। সবার মত সে নির্বিকার হতে পারছিল না। যদিও বন্ধু সহকর্মী গোলাম মওলা তাকে বলে: তুই শালা ডবল আনসার। আমরা সবাই সিঙ্গেল, আর তুই আনসার আলী আনসার।

আনসার ভাবে বাপ তার নাম রাখার সময় কি ভেবেছিল ছেলে আনসার হবে?

বাপের কথা মনে হতেই একবার জনকের মুখটা ভাবতে গেল সে, কিন্তু মুখটা মনে পড়ল না। বরাবরের মত তার সেই কাফন শোভিত একটা লাশের অস্তিত্ব চোখের সামনে ফুটে ওঠে। বয়স তখন চার হবে সেই সময় বিয়োগ প্রাপ্ত পিতার কাফন ঢাকা দৃশ্যটা ছাড়া আর কিছু মনে পড়ে না। মা ত বিয়োতে গিয়েই গেছে, সুতরাং মা বললে যে স্নেহের আধার লোকে দেখতে পায় আনসার তার অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারে না। বরং মায়ের কথা ভাবলেই তার নানির কথা মনে পড়ে। মা ত নানীর মেয়ে, হয়ত তার মতই ছিল। বুড়ো নানী যদি হঠাৎ জোয়ান হয়ে যায় মায়ের রূপ নিতে পারে।

মা-বাপ নেই বলে নানীর আদর তার একমাত্র আশ্রয়। ছোটবেলায় নানীকে কম জ্বালায়নি। পরের বাড়ী কাজ করে তাকে মানুষ করেছিল, আর সে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত। তার টনটনে বোধ ছিল যে এটা সে ভালো করছেনা, স্কুলে ঠিক মত যাওয়া উচিত স্কুল ফাঁকি দেওয়া ঠিক নয়, নানীর গতর-খাটা পয়সায় পেট ও স্কুল চলছে, এতে তার আল্লারকাছে হাজার শোকর করা উচিত, কিন্তু বাঁধন ছাড়া একটা ভাব তাকে এমন পেয়ে বসেছিল যে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য ও টেনেটুনে নিয়ে সে স্কুল ছেড়ে দিল। নানী কাঁদল, মারল বাড়ী থেকে বের করে দেবার ভয় দেখাল.. ওর বাপকে গালাগালি দিল, দিল নিজের মরা মেয়েকে অভিশাপ, তারা যেন ষড়যন্ত্র করে আনসার আলীকে রেখে গেছে তাকে জ্বালাতন করার জন্যে। কিন্তু কিছু হোলো না, আনসার আলী খায় দায়, বন্ধুদের

কাফনের স্বপ্ন

বুলবন ওসমান

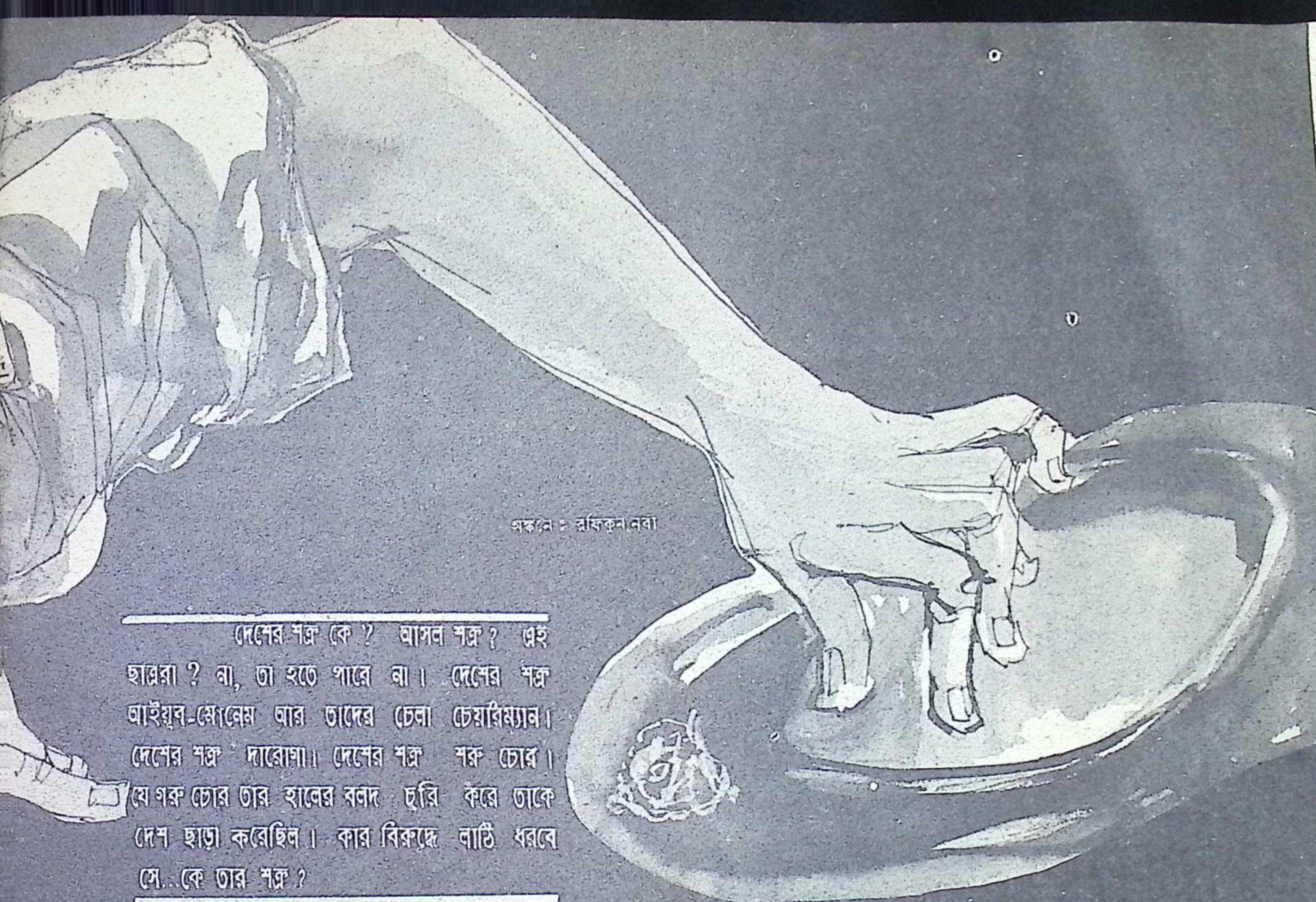

অঙ্কন : রফিকুন নবী

দেশের শত্রু কে ? আসল শত্রু ? এই ছাত্ররা ? না, তা হতে পারে না। দেশের শত্রু আইয়ুব-মোনেম আর তাদের চেলা চেয়ারম্যান। দেশের শত্রু দারোগা। দেশের শত্রু গরু চোর। যে গরু চোর তার হালের বলদ চুরি করে তাকে দেশ ছাড়া করেছিল। কার বিরুদ্ধে লাঠি ধরবে সে...কে তার শত্রু ?

সঙ্গে আড্ডা দেয়, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ তার মাথায় কে যেন বুদ্ধি দেয় ব্যবসা করলে জীবনের ধারা পাল্টে যাবে, এমন ভবঘুরে জীবন থাকবে না। ব্যবসা কথাটা শুনতে যত সহজ কাজে তত সহজ নয়, বিশেষ করে কপর্দকহীন অনভিজ্ঞ কিশোরের কাছে। তাই সে ভেবে চলে কি ভাবে রাস্তা বের করবে।

তাদের ডেরার অদূরে ছিল একঘর গোয়ালা, দুধ বেচে জীবন ধারণ। হঠাৎ চোখ খোলে আনসারের দু'টো গরু কিনলে কেমন নয় ? ইচ্ছারা ঘোড়া হলে ফকিরও ঘোড়ায় চড়ত, কিন্তু তা হয় না, তাই বাসনা পূরণের রাস্তা নূতন করে ভাবতে হয় আনসারকে। নানাকে না জানিয়ে সে স্টেশনে কুলীগিরি শুরু করে। বছর-খানেক পর তার হাতে পাঁচ শ'টাকা জমলে সে একদিন একজোড়া বকনা কিনে নানাকে অবাক করে দেয়।

গরুর বাচ্চা হলে আনসার নিজেকে হারুণ-অর রশীদের মত বাদশাহ ভাবতে শুরু করে।

খরচের পরও দিনে তিন চার টাকা থাকে তাদের। নানী-নাতির দিন পালে হাওয়া লাগা নৌকোর মত তর তর বয়ে চলে।

দেশে এল ফাতেমা জিন্নাহ আর আয়ুব খাঁর নির্বাচন।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে আনসার ছুটে বেরিয়ে গিয়ে মিছিলে যোগ দিত। গলা ছেড়ে চীৎকার করত, আয়ুব শাহী ধ্বংস হোক ········ ফাতেমা জিন্নাহ জিন্দাবাদ।

নির্বাচন শেষ হোলো, সব উৎসাহ ঝিমিয়ে পড়ে। গোটা ময়মনসিং শহরটা হঠাৎ করে কেমন নীরব হয়ে গেল। এই পরাজয় যেন আনসার আলীর নিজের। চারিদিকে শুনতে থাকে দেশটাকে এবার শেষ করে দিবে, সব শোষণ করে নিয়ে যাবে, ছিবড়ে করে ছাড়বে...দেশের নূতন রাজধানী হচ্ছে ইসলামাবাদে, সব টাকা খরচ হবে সেখানে।

কিছু দিন পরই এদিক ওদিক থেকে দু'একটা খবর পেতে থাকে আনসার এ-গ্রামে গরু চুরি গেছে, ও-গ্রামে বলদ, চেয়ারম্যানদেরদের বললেও কিছু হয় না, পুলিশে কেস নেয় না, গরু চোরেরা না কি আয়ুব-মোনেমের লোক···আনসারের বড় ভয়...দেশী মানুষ মোনেম সাহেব গভর্নর তবু তাদের বিপদের কথা শুনছে না কেন ? লোকে বলে, মোনেমটা আয়ুবের দালাল, কুকুর...মানুষ এমন নিজের দেশের লোককে কেমন করে কষ্ট দেয়, ভেবে পায় না আনসার আলী। ইসলামাবাদে নূতন রাজধানী তৈরীর চেয়ে গরু চুরির হিড়িকটা তাকে ভীষণ ভাবিয়ে তোলে। রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারে না। সামান্য খুট খাট শব্দ হোলেই বাতি হাতে হাজির হয় গোয়ালঘরে। সব ঠিক আছে দেখে তবে বুকে ভরসা পায়. অনেক সময় বাকী রাতটা দেয় জেগে কাটিয়ে.. পরে বেলা করে ঘুমায়..

নানীকে এখন আর লোকের বাড়ী কাজ করতে দেয় না আনসার আলী। আত্মসম্মানবোধ পয়সার সাথে যুক্ত, তাই এখন তার নানী আনসারের কথা মত কাজ করে। অতীতের সব গল্প শোনায় আনসারকে, তার নানার কথা, তার মায়ের কথা, আনসারের শুনতে ভালো লাগে, বুকের কাছটা কেমন ব্যথা ব্যথা করতে থাকে ভাবে সবাই যদি এখন বেঁচে থাকত, মজায় হৈ চৈ করে কাটান যেত..

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের দিনটার কথা আনসার এখনো ভুলতে পারে না।

শীতের রাত, ঘুমটা কি বেশী দিয়ে ছিল ? সকালে গোয়ালঘরের দরজা দেখে বুকটা কেঁপে ওঠে, ভেতরে ঢুকে কেঁপে ওঠা বুক ধড়াস করে ছিড়ে পড়তে যায়। গাভী জোড়া নেই। বাচ্চা আছে, কিন্তু গোটা গোয়ালঘর যেন ফাঁকা··

আনসার দৌড়ে নানীকে জাগায়।

নানী, সকালে উঠছিলাইন, গরু বাহির করছিল···

গরু, গরু আমি বাহির করতে যাব কান! বিস্ময়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বৃদ্ধা। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আনসার। তার নানী আরো অবাক।

কি হইল ?

তারপর দু'জন মিলেই কেঁদেছে।

অনেককে জিজ্ঞেস করেছে, কিন্তু ঠিক কোন হদিস দিতে পারেনি।

যাকে সন্দেহ করেছিল আনসার সেই হাসমত শেখের বাড়ী যায়। তার সন্দেহ ঠিক। হাসমত শেখ পাঁচ শ' টাকা চায়, তাহলে গরু দিতে পারে।

বাড়ীর নীচে গর্ত করে হাসমত শেখ চোরাই গরু লুকিয়ে রাখে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, গাছপালা দিয়ে ঘেরা।

পাঁচ শ' টাকা কোথায় পাবে আনসার ?

চেয়ারম্যানের পা জাপটে ধরে, আমার গরু ফিরাইয়া দ্যান।

কি হইছে তোর গরুর ?

হুজুর হাসমত শেখ আমার গরু ধইরা রাখছইন।

যা ব্যাটা. বাজে বকিস না। হাসমত শেখ তর গরু ধইরা রাখব ক্যান ?

ধইরা রাখছে। তাইনে আমারে পাঁচ শ' টাকা দিতে কইছইন।

ত টাকা দিয়া দে।

টাকা কথাইক্যা পামু।

তয় আমি কি করুম।

আপনে আমারে পাঁচ শ' টাকা হাওলাত দ্যান।

পাঁচ শ' টাকা! আমি হাওলাত দিমু? চেয়ারম্যান আঁতকে ওঠে।

নাতির পর নানী। দু'জনের কান্নাকাটি ব্যর্থ হয়। চেয়ারম্যান কিছু করতে পারল না। থানায় দারোগা বললে চেয়ারম্যানকে বলতে।

বাচ্চা ছুটোকেও বেচে দিয়ে এ-পর্বের এখানেই ইতি করে আনসার।

আবার আগের মত বেকার। ব্যবসার পাট তার চুকল। তার নানী আবার যোগ দেয় পরের বাড়ীর বাঁদীগিরিতে।

আনসার বাহিনীতে লোক নেবে শুনে একদিন দুরু দুরু বুকে সে রিক্রুটমেন্ট লিষ্টে নাম লেখায়। ডাক্তারী পরীক্ষার পর সে নির্বাচিত হয়ে যায়। ইউনিফর্ম পরে যেদিন প্যারেড করতে মাঠে লাইন দিয়ে দাঁড়ায় সেদিনের আনন্দ এখনো মনে করে সে পুলকিত হয়। খাওয়া-দাওয়া পাওয়া যায়, আবার দিনে তিন টাকা, মন্দ কি! শুধু ক্যাম্পে থাকতে হয় এই যা, নানীকে ছেড়ে প্রথম দিকে খুব খারাপ লাগত। পরে গা সওয়া হয়ে যায়, তরুণ বন্ধুদের সাথে দিন কাটে মজায়। ফুটবল, ভলিবল আছে, আছে শহরের বাইরে গিয়ে মহড়া, একরকম মন্দ কাটছিল না...তবু বাঁটে দুধভরা পুরুষ্টু গাভী দেখলে এখনো তার মন কেমন করে ওঠে। অন্যরা লাঠির বাড়ী মারে, আর তার ইচ্ছা হয় গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়।

বছরখানেক না যেতেই তারা এ কি মসিবতে পড়ল। গোটা দেশ যেন বারুদের কারখানা। কথায় কথায় আগুনের ফুলকির মত জ্বলে ওঠে দেশবাসী, আজ এদের দাবী, কাল ওদের, ...

মিছিল, বাধা দিতে গিয়ে তারা হিমশিম খেয়ে গেছে। এরি মধ্যে কয়েকবার ই'টের ঘায়ে মাথা ফেটেছে তার।

এ-সব দেখে তার নানী তাকে আরো গাল দেয়, গরু চোর আয়ুব-মোনেমের রাজত্ব গেলে তোদের কি! তোরা কেন মার খাস! যে সব ছাত্ররা এই আন্দোলন করে তাদের মারিস, তোদের শরম করে না ?

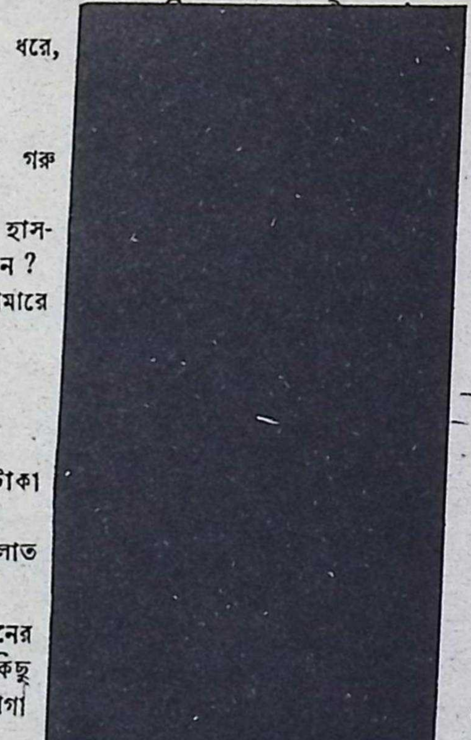

নানীর কথাটা চাবুক মেরেছিল আনসারকে। তাইত কেন তারা মার খায়, আর যারা দেশের ভালো চায় তাদের মারে? যারা আন্দোলন করছে দেশের ভালোর জন্যেই ত করছে দেশের ভালো হলে তারও ভালো হবে, গরু চোরের দৌরাত্ম বন্ধ হবে···

দূর থেকে মিছিলের ধ্বনি শোনা যায়। একটা ভীষণ জলস্রোত যেন স্লুইস গেটে ধাক্কা মেরে ভেঙ্গে ফেলতে চাইছে।

আয়ুবশাহী, মোনেমশাহী, ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক...কথাটা পরিষ্কার শোনা যায়।

আনসার এ্যাডজুটেন্ট গোফরান সাহেব নিজে আছে কম্যাণ্ডে। সবাইকে সাবধান করে। টাউন হলে বিডি মেম্বারদের মিটিং, যেন বাধা না পায় মেম্বাররা।

সটান হয়ে দাঁড়ালেও বিরাট জন সমুদ্র দেখে সবার মুখে চুন। বুক ধড়াশ ধড়াশ করে।

মিছিলের শব্দ এখন আরো জোরাল, আরো দৃপ্ত স্পষ্ট, আয়ুবশাহী, ধ্বংস হোক...দেশের শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রু, ধ্বংস হোক...

দেশের শত্রু কে ?

এই প্রশ্ন আনসার তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বন্ধু জামালকে জিজ্ঞেস করেছিল।

কেন, আয়ুব খান।

আয়ুব খান, না গরু চোর ? চেয়ারম্যান, না দারোগা ?

এরা সবাই ঠিক দেশের শত্রু নয়, আয়ুব খান চোরদের সাপোর্ট করছে, তাই মূল শত্রু আয়ুব খান।

কিন্তু আয়ুব খানের বদলে আর এক খাঁ আসবে ?

আসুক, তাতে আমাদের আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবে না। যতদিন না জনসাধারণের হাতে দেশের ক্ষমতা আসছে আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

মিছিলে একেবারে সামনে।

গোফরান সাহেবের আদেশ মত সবাই কর্ডন করে দাঁড়ায়।

মিছিল থমকে দাঁড়িয়ে মুহুর্মুহু চীৎকারে ফেটে পড়ে।

আপনারা ফিরে যান, আর এগোবেন না···গোফরান সাহেব চীৎকার করে বলে।

কে শোনে কার কথা। মিছিলের সবাই এগিয়ে যেতে যায়। ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়ে যায়।

উপায় না দেখে গোফরান সাহেব হুকুম দেয়, চার্জ।

মুহূর্তে আনসাররা লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পড়ি মরি করে সবাই দৌড়াচ্ছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে মিছিলের সম্মুখ ভাগ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। তারপর শুরু হয় পাল্টা আক্রমণ। শিলাবৃষ্টির মত ইটপাটকেল বর্ষিত হতে থাকে।

আনসাররা পিছু হটতে শুরু করে।

পুনর্বার আনসাররা ক্ষিপ্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছু লোক আহত হয়; কিন্তু পালিয়ে যায়। এবার পেছন থেকে কিছু লোক এক লাকড়ির দোকান থেকে চ্যালাকাঠ হাতে সম্মুখ ভাগে হাজির হয়। শুরু হয়ে যায় খণ্ড যুদ্ধ।

আনসার আলী নিষ্ক্রিয়। গরুচোরদের পক্ষ সে নেবে না।

অবস্থা বেগতিক দেখে গোফরান সাহেব পালাতে শুরু করলে সবাই বিদ্যুৎগতিতে তাকে অনুসরণ করে। মুখে হাসির রেখা নিয়ে আনসার নিজের দু'পাকে কাজে লাগাতে যাবে হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন তাকে দু'হাতে জাপ্টে ধরে। সে ছাড়িয়ে ছুট লাগবার আগেই লোকেরা ঘিরে ধরে। মাথায় একটা বাড়ি পড়ে চ্যালাকাঠের। চোখ অন্ধকার হয়ে আসে তার। গা এলিয়ে ধরাশায়ী হয়ে যায়। শুনতে পায় ক্রুদ্ধ সব গর্জন, কে যেন বলে, এক শালাকে পাওয়া গেছে মার মার··· আমাদের টাকা খেয়ে আমাদিকেই মারবে, মার শালাকে - - - মাথায়, মুখে, বুকে, পেটে, লাথের পর লাথ পড়তে থাকে।

সে চীৎকার করে কি যেন বলতে গেল. হয়ত, নানি. বাবা. মা সবাইকে সাহায্যের জন্যে ডাকছিল। হয়ত বলতে গেল, আমি আপনাদের দলে, আমি কোন দোষ করি নাই কিন্তু সোঁ সোঁ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না।

পরমুহূর্তে তার মনে হয় সে যেন স্বপ্ন দেখেছে এবং বার বার তার চোখের সামনে সাদা কাফনে জড়ান একটা লাশের ছবি ভাসতে থাকে··· তার মনে হোলো লাশটার মুখ দেখা যাচ্ছে এবং বড় চেনা, মনে হোলো তার বাবার মুখ, আবার মনে হোলো না তার নিজের মুখ - - - পর মুহূর্তে আর চিনতে পারল না, ছেঁচা ইঁদুরের মত মুখটা চেনা দায়।

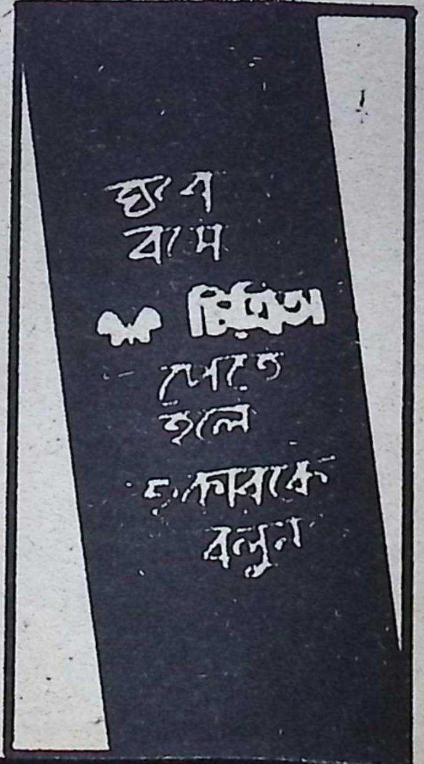

চুয়ান্ন সালের নির্বাচন।

জনসাধারণের ঐক্য চাই তাঁবেদার মুসলিম লীগ সরকার উচ্ছেদের জন্যে। উচ্ছেদ শুধু না, এ নির্বাচনই পূর্ববাংলার বুকে মুসলিম লীগের কবর। নেতারা এক হয়েছেন। ভোট চাই হক-ভাসানীর বাক্সে। ভাসানী বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে জনতাকে আহ্বান জানাচ্ছেন জেগে ওঠার, এ, কে ফজলুল হক স্বপ্নের কথা বলছেন : শাস্য শ্যামলা বাংলার। বলছেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, শেখ মুজিব, বলছে রাম শ্যাম যদু মধু। মাঠে নেমে পড়েছে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবি।

নেমেছেন আলতাফ মাহমুদ।

বরিশালের ছোট লোকালয়ে জনসভা। সভার শেষে বসবে গানের আসর। কিন্তু দেখা গেল মাইক ফেল করেছে। পনেরো হাজার দর্শক আগ্রহে অপেক্ষা করছে গান শোনার জন্যে। আলতাফ মাহমুদ উঠলেন গান গাইতে। ধরলেন উদাত্ত কণ্ঠে : 'বাঙ্গালী...ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি—'

বিক্ষুব্ধ জনসভা শান্ত হয়ে এল। আলতাফ মাহমুদর উদাত্ত কণ্ঠ গেয়ে চললো। কেঁদে ফেললে সভার সামনের সারিতে বসা এক প্রৌঢ় কৃষক। কাঁদতে লাগলো আরো অনেকে। দর্শকরা অবাক হয়ে দেখলো আবেগে কাঁদছেন গায়ক স্বয়ং।

'নেশায়, আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, বলতে পারেন বয়সের দুরন্ত আবেগে গান গেয়ে বেড়িয়েছি। জনতার মধ্যে, সাধারণ মানুষের গান'—আলতাফ মাহমুদ বললেন, 'গান শুনে মানুষ ক্ষিপ্ত হয়েছে, কখনো কেঁদেছে আবেগে বিহ্বল হয়ে।'

আলতাফ মাহমুদই সুর দিয়েছেন একুশের প্রভাত ফেরীর গান : 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী। আমি কি ভুলিতে পারি।'

কথা বলছিলাম আলতাফ মাহমুদের বাড়ীতে বসে। আমি যখন গেলাম, তখন তিনি বাইরের গাড়ী থেকে টেনে বের করছিলেন সাউণ্ড বক্স এবং মিউজিকের এটা সেটা। বসার ঘরেই নামিয়ে রাখলেন জিনিসগুলো। বললেন, 'বাড়ীটা ছোট হয়ে গেছে। আরো ঘরের প্রয়োজন।'

ঘর ছাড়া বাউণ্ডুলে আলতাফ মাহমুদ এখন বৈষয়িক, সংসারের কথা ভাবেন, ভাবতে হয়। পথের নেশা আর নেই।

পথ ছেড়ে সিনেমার সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে যোগ দেন জীবিকার তাগিদেই। প্রথম ছবি বেবী ইসলামের তানহা। তার পর থেকে পুরোপুরিভাবে এই জগতেরই বাসিন্দা।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ঢাকার সঙ্গীত পরিচালকদের মধ্য সৃষ্টিশীল কিছু করার কোন চেষ্টাই নেই, তার কারণ কি?'

'কারণ অবশ্যই সময়ের স্বল্পতা। এখানে বর্তমানে কে কত কম সময়ে ছবি করতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলছে। ফ্লোর ভাড়া এবং ফ্লোরে অতিরিক্ত চাপই এর জন্যে দায়ী। মাঝে মাঝে পরিচালক এত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করেন যে সঙ্গীত পরিচালক দু'তিন দিনের বেশী সময় হাতে পান না। এই দু'তিন দিনে সাত আটটা গানে সুর দিতে হয়, আবহ সঙ্গীত রচনার সময় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ছবির রাশও দেখার সুযোগ হয়না। বিভিন্ন মুডের কিছু সুর রেকর্ড করে রাখা হয়, প্রয়োজন মত তা লাগিয়ে দেন—এতে সৃষ্টিশীল কিছু করার সুযোগ কোথায়?'

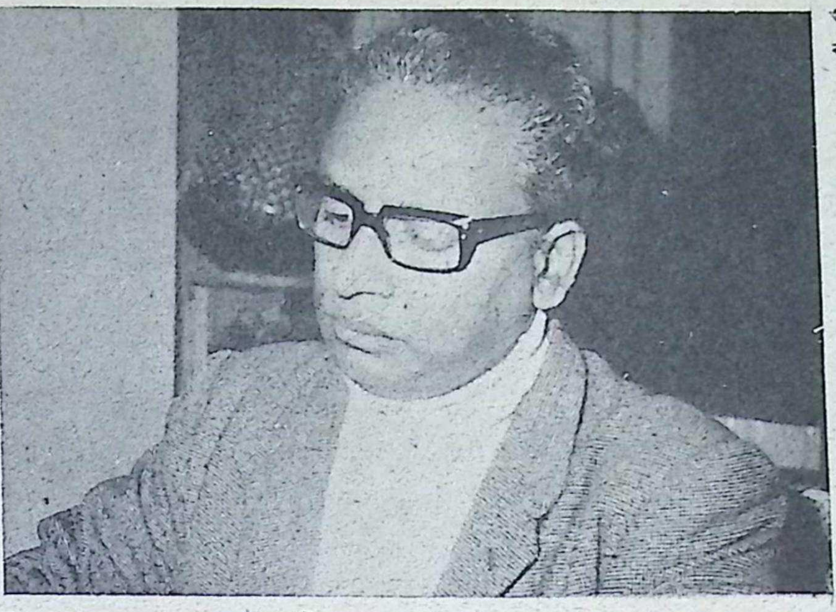

জনতার শিল্পী

আলতাফ মাহমুদ

'সুরের চৌর্যবৃত্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত?'

'চৌর্যবৃত্তির কথা বললে তাতে আমিও একজন অপরাধী।' আলতাফ মাহমুদ বললেন, 'কি করবো বলুন, মাসে অনেক সময় ত্রিশটা গানের সুর দিতে হয়—এতগুলো নতুন সুর সৃষ্টি করা খুব সহজ ব্যাপার নয়।'

'এতগুলো সুর সৃষ্টি এক সঙ্গে করেন কেন?'

'না করে উপায়? এখানে একটা ছবিতে সুর দিয়ে যা পাওয়া যায় তা খুবই কম। সে জন্যে যে কাজ হাতে আসে তা ফেরাতে পারি না।'

বিদেশের কথা বললেন, যেখানে একজন সঙ্গীত পরিচালক কতজন সহকারীর সাহায্য গ্রহণ করেন, সঙ্গীত রচনার সময় কতজন যন্ত্রশিল্পীকে নিয়োগ করেন। বললেন, 'চুরি করা সুর ব্যবহার করি অনেক সময় পরিচালকের ইচ্ছায়। এখানে আমাদের খুব একটা স্বাধীনতা নেই।'

আলতাফ মাহমুদ অতি সহজেই পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতাকে মেনে নিয়েছেন। প্রতি কথায় আত্মসমর্পণের সুর ধ্বনিত হয়।

'কার সঙ্গে কাজ করে আনন্দ পান?'

'জহির রায়হান, কাজী জহির—' আলতাফ মাহমুদ আরো দু একটা নাম বলেই বললেন, 'দেখুন, আসলে আমি জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালক নই, তবে কয়েকজন পরিচালক আমাকে পছন্দ করে, যার জন্যে কাজও পাচ্ছি, বেশ টিকেই আছি বাজারে।'

বললাম, 'কেন, আনোয়ারা, বেহুলার গান তো বেশ জনপ্রিয়।'

'হাঁ হয়েছে কিন্তু তেমন কোথায়?' সন্দেহের সুর শিল্পীর কণ্ঠে।

সত্যি বলতে কি আমার কেন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিলো চলচ্চিত্র ও চৌর্যবৃত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে। কারণ আজকে যে আলতাফ মাহমুদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাচ্ছিলাম তিনি কয়েকটি জনপ্রিয় গানের সুরকার নন, জনতার শিল্পী।

আলতাফ মাহমুদ। তিনি গান গেয়েছেন বিশাল জনতার মাঝে বসে। চুয়ান্নর নির্বাচনের অনেক বছর পর এই 'সত্তুরের নির্বাচনে তিনি ভোট দিতে গিয়েছেন কিনা সন্দেহ। যিনি অন্যের সুর নিজের নামে চালান—অথচ আমার মনে হল, এখনও জ্বলছে ছাই ঢাকা আগুন। নইলে আইয়ুব খানের আমলে অনেক বিখ্যাত কণ্ঠ থেকে রেডিও পাকিস্তান ও টি ভির কল্যাণে যখন ডিকেডী গান শোনা গেছে তখন আলতাফ মাহমুদ পল্টনে গেয়েছেন : 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা' আজ জেগেছে এই জনতা...

জনতার জন্যে গেয়েছেন। জনতাকে জাগাতে চেয়েছেন, কিন্তু একসময় ক্লান্ত হয়ে নিজেকে সমর্পণ করেছেন 'সুযোগে'র হাতে। আজকে যখন জনতার বিজয়ের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, জনতার উদ্বেলিত স্বপ্নের কণ্ঠস্বরই হয়তো শিল্পীকে জাগিয়ে তুলতে পারে—অসম্ভব কি।

স্ত্রী ও কন্যাসহ আলতাফ মাহমুদ

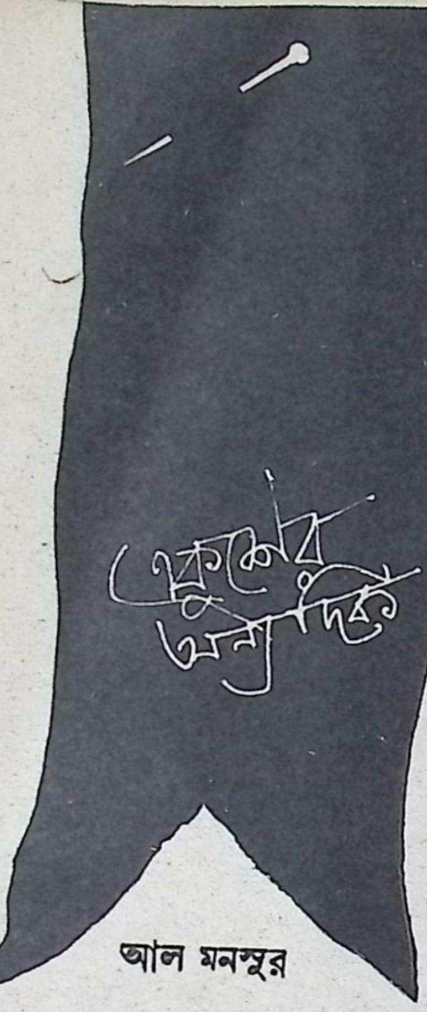

একুশের অন্যদিকে

আল মনসুর

একুশ আর কোন দিন নবীন সূর্যের আলোয় হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে না। রাত জাগরণের পর একটি ক্লান্ত ভোর অগোচরে হাজির হবে।

গ্রীনিচে যদিও সন্ধ্যা সাড়ে আটটা বাজে, আমাদের সরার পূর্ব বাংলায় তখন রাত আড়াইটে।

ইতিপূর্বে শেখ মুজিব মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। মুহূর্মুহু কতিপয় জীবিতদের জন্য জিন্দাবাদ ধ্বনি ও মশালের উজ্জ্বল আলোকের ভীড়ে শহীদ মিনার বিব্রত ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়ে অন্ধকারে মুখ লুকোতে চাইলো।

প্রভাত ফেরী এখন হতে পারে না।

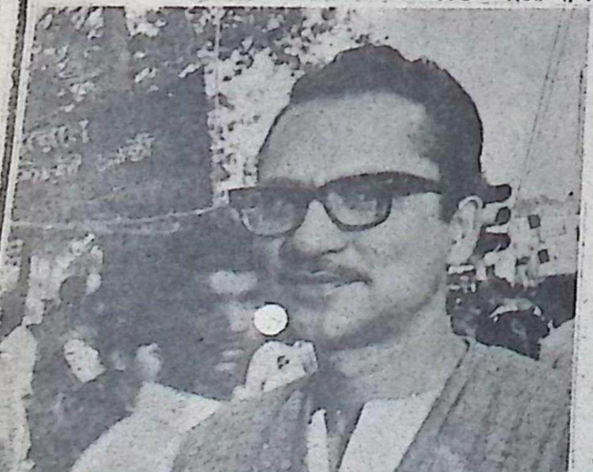

ডক্টর আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন

হতে পারে রাতের দরবারী। সারা রাতের জন্যে আসর বসেছে, এখানে ওখানে। আড়াইটের ঢাকার কুয়াশা ভেজা সড়ক আজ ব্যস্ত। কোন অখ্যাত চাঁন তারা ক্লাব আর পাড়ার যুবক সংঘ এবং এমনিতর প্রচুর মিছিলের আনাগোনায় ব্যস্ত। প্রভাত ফেরীর কণ্ঠগুলো কোলাহলে নির্জীব হয়ে যাচ্ছে। এদিক ওদিক প্রচুর মাইক। রাত্রির অন্ধকার ক্লান্ত বাতাসে 'মেরে তসবির লেকর কেয়া করোগে তুম' গানের কালি ভেসে এল চাঁন খানের পুলের ওদিক থেকে। প্রভাত ফেরী নেই। প্রভাতে সুপ্তি ভাঙ্গার প্রয়োজন এবার নেই। সবাই জেগে আছে। অথচ তার মধ্যে—

কার্জন হল হাইকোর্টের সড়কে এগিয়ে যাচ্ছে একটি মিছিল। পুরোভাগে তার বিশালফুলের মালা। রিক্সায় মাইক। হৃদয়ের নিংড়ানো শ্রদ্ধা মেখে তারা গাইছে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' ...।

না, অন্ধকারের সেই মূক সড়ক জানে, মিছিল গাইছেনা। একটি টেপ রেকর্ডার তার যান্ত্রিক বুক নিংড়ে যে শ্রদ্ধা আজ জানিয়ে গেল, পুরো মিছিলের অনেকগুলো হৃদয়ও তাতে সামান্য অংশ নিতে ব্যর্থ, অপারগ।

রাতের জলসা ভাংলো। গাড়ীগুলো ছুটলো মহল্লায় মহল্লায়। পোষাক বদলে, জুতো খুলে আসতে হবে মিনারে।

প্রতিযোগী ফুলের মালায় মিনারের পাদদেশ আচ্ছন্ন।

সমস্ত পাপ এড়িয়ে সূর্য্য ছুঁলো মিনারের চূড়ো। ক্রমশ: সমস্ত অবয়ব।

রাতজাগা শহরবাসি ক্লান্ত। অথচ—

প্রচুর মানুষ। প্রচুর কণ্ঠস্বর। প্রচুর সংলাপ।

প্রচুর হাসি। আনন্দ।

সমস্ত মিলিয়ে একটি কোলাহল।

এখানে শ্রদ্ধা আন্তরিকতা হয়তো আছে। কিন্তু—

এখানে আনন্দ কুড়িয়ে নাও মুঠি ভরে।

শামসুর রাহমান, গৌরবর্ণ অমায়িক ভদ্রলোক। কবিতা লিখে প্রায় জনতার সম্পত্তিতে পরিণত। তিনি বললেন, 'মেলা'। ভীড়ে তাকে বিভ্রান্ত, অসহায় লাগছিল। সেই যখন মজা পুকুরের কোনে সন্ধে বেলা ডাহুক ডাকতো : তারা, তিনি এবং তার ছোটবেলার ভালবাসায় জড়ানো সঙ্গি, এক হাঁটু ধুলো মেখে ফিরতেন তিন গাঁয়ের পৌষ-সংক্রান্তির মেলা থেকে— এ যেন তাই।

ডক্টর আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন মিনারের পাদদেশের ঐ মেলায় দাঁড়িয়ে তবু, আশাবাদী আমরা, সচেতন আমাদের সংগ্রাম সম্পর্কে,' তিনি বললেন। এই কোলাহলে তিনি দেখেছেন উৎসব 'সংগ্রামী চেতনা'।

মিনারে যায় নি মেয়েটি। শিমুল গান গায়, মতিঝিল সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের দশমশ্রেণী, ও বিদ্যায়তনের সবার প্রিয় ছাত্রী। অত্যন্ত ক্ষুদ্রস্বরে পড়ার টেবিলে বসে বলল, 'গত বারে একটা অদ্ভুত মেয়ে দেখেছি আমি। পরনে তার কালো শাড়ী। কপালে কালো টিপ। এলো খোপায় সরু ফুলের মালা। হাতে তার একগুচ্ছ ফুল। কি অপূর্ব, কি মহিমাময়, কি গভীর শ্রদ্ধার অলীক পবিত্রতায় সে এগিয়ে যাচ্ছিল মিনারের সিড়ি বেয়ে। সমুখে হঠাৎ পড়ল কিনা সেই 'আজব বালক'। চলচ্চিত্রের একটি বিস্ময়। সেই পবিত্র অলোকিত শ্রদ্ধার আলো গায়ে জড়ানো মেয়ে হাতের ফুলের গুচ্ছ তুলে দিল 'আজব বালকে'র অসহায়, বিব্রত হাতে। তারপর ফিরে এলো'।

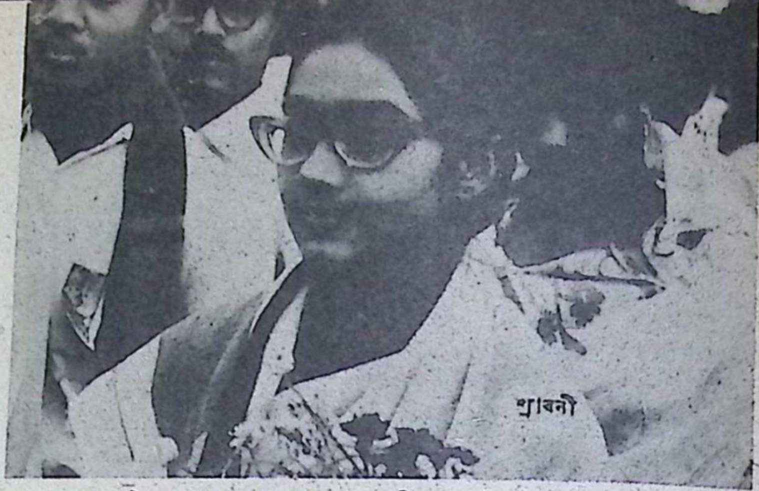

শ্রাবনী

মিতু, ইংরেজী মাধ্যম বাওয়ানী বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। মিনারের ভীড় এড়িয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল সে। দৃঢ়, স্পষ্ট উচ্চারণে তার শ্রদ্ধার বিশ্বাস জানালো।...'কিন্তু, সত্যিই, দেখে মনে হয় না এখানে শ্রদ্ধা আছে বিন্দুমাত্র।'

মিতু

শ্রাবনী, বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষ মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী। মিষ্টি মেয়ে। জীবনে এই প্রথম এসেছে শহীদ মিনারে। একটি বিস্ময়কর এবং অজানিত শিহরণে সে শিহরিত হয়েছে বারবার। 'অন্য কোথাও, যেমন সিনেমা হল ইত্যাদিতে ভীড়ের মাঝে মেয়েদের পাশে সবাই ভদ্র লোক, এমন বলা কঠিন। কিন্তু মিনারে এত ভীড়ের মাঝেও একটি আশ্চর্য নিরাপত্তা আমি বোধ করেছি।—এবং মনে হয়েছে, এটি এমন একটি দিন, যা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র বাঙ্গালীর। যা, অসাম্প্রদায়িক, বলে শ্রাবনী' চারদিক দেখলো।

অ, আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণমালা সাজানো বিশাল শেভ্রলের যাত্রী পঁচাত্তর

ভাগ ইংরেজী ও পঁচিশ ভাগ বাংলায় অত্যধিক দৃঢ়তার সঙ্গে জানালো, তারা বাংলাকে অত্যন্ত ভালবাসে।

ক্রীষ্টমাস-ট্রির অনুকরণে রচিত হয়েছে অক্ষর বৃক্ষ, অক্ষর ঝুলছে। মেয়েরা পরেছে একুশের শাড়ী। রূপায়ন প্রচুর ব্যবসা করেছে, মেয়েদের শাড়ীর সংখ্যা দেখে বোঝা গেল। রূপায়ণের প্রতি উপদেশ : অক্ষর বৃক্ষের অক্ষর বের করুন। শিল্পী, বর্তমানে পটুয়া, কামরুল হাসান তার পটুয়া-গোষ্ঠি নিয়ে অক্ষর বৃক্ষের প্রচার চালিয়ে ছিলেন। আর রূপায়ণ বের করেছে অক্ষরের শাড়ী। এদিকে অক্ষর বৃক্ষ আর অন্যদিকে রাস্তায় পদতলে অক্ষর। এবার আর্ট কলেজ আল্পনা করেছে যা তার চেয়ে বেশী লিখেছে কলেজের নাম।

আবুল ফজল, রিকসাওয়ালা। সে জানে আজকের দিন এগারো দফার শহীদের দিন। বয়স তার আটত্রিশ। তবু প্রাত্যহিক বেঁচে থাকার সংগ্রাম তার উনিশ বছরের যৌবনের ইতিহাসকে করেছে অস্তিত্বহীন। শহীদ দিবসের আত্ম-উৎসর্গ সে বোঝে। কিন্তু কেন

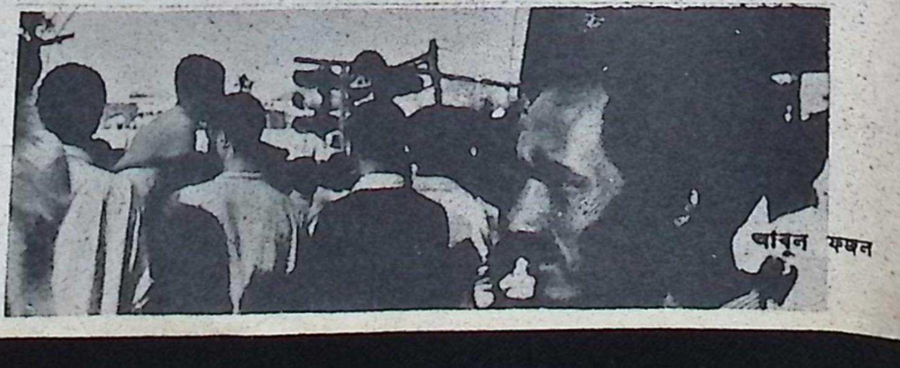

আবুল ফজল

তা জানেনা। কেউ তাকে বছরের অন্য ৩৬৪ দিনে বুঝিয়ে দেয়নি।

ইতিমধ্যে—

A. হ্যালো, গুড মর্নিং। কেমন আছ?

B. হাউ নাইস!

C. ডোন্ট ইয়ু ব্রিং ইওর ক্যামেরা! ইট্স্ এ স্কোপ।

D. হেই, ম্যাগাজিন কেমন সেল হচ্ছে?

E. এই যে, এত ইংরেজী বলছেন কেন? ওহ, আই এ্যাম সরি।

এবং etc.

এদিকে বাংলা একাডেমীর মাঠে হাট বসে গেছে। প্রচণ্ড বেগে বিক্রি হচ্ছে শহীদ স্মরনিকা। যার অধিকাংশে বাংলা ভাষার পিণ্ডি চটকানো হয়েছে অখাদ্য কুখাদ্য কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প নামের বাসী রক্ত ও গলিত পলাশ ফুলের মাধ্যমে।

অধিকাংশ স্মরনিকা সেই বিশেষ প্রতিষ্ঠান, যা জাতীয় পুর্নগঠনের নামে বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে হত্যার সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তার বিজ্ঞাপনে কলঙ্কিত।

ওদিকে একাডেমীর কবিতা পাঠের আসরে ফুলকবি, হাফকবি, বাধাকবি— তাবৎ কবি তাদের কবিত্ব উজাড়ে ব্যস্ত। মহা ক্ষাপ্পা দর্শক।

'হালার, এই কবি গান শুনতে আইছে কেঠায়। গান-উন নাইক্কা?'

তারপর সংগীতানুষ্ঠানের ঘোষণায় দর্শকের তুমুল চিৎকারে বিস্মিত, ভীড় থেকে বিচ্ছিন্না বুদ্ধিজীবির প্রশ্ন: 'গণ্ডগোল হচ্ছে কেন?'

উত্তর এল ভীড় থেকে, 'এটা আনন্দ চিৎকার।' সারারাত ধরে গান গাওয়া শিল্পীরাই চেঁচে উঠেছেন। বেলা দশটাতেই সবার ক্লান্তি নেমে এসেছে।'

কিন্তু দর্শক আরেক উত্তেজনায় অধীর।

আগামী অল্প দিনেই 'জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে বাংলা চালু করা হবে।'

বাঁশী বেজে গেছে। অপেক্ষা কেন? প্রতিযোগিতার দৌড় শুরু হয়ে গেছে। কে প্রথম হবে?

যখন দেশের শতকরা নিরানব্বই জন অশিক্ষিত।

যখন

দেশের শতকরা নব্বইজনের লেখাপড়া করবার সামর্থ নেই।

তখন

আসুন

তবু

এই দৌড় প্রতিযোগিতার আনন্দে আমরা আনন্দ চিৎকার করি।

অথবা দুশ্চরিত্র মধ্যবিত্তের হাত থেকে মুক্তি দেই একুশকে। উৎসবের বাতি জ্বলুক। স্নিগ্ধতা, রোমান্টিকতা আবেগ শেষ হয়ে গেছে যখন, তখন, সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তের স্বপ্ন বিলাসের দিনটি একবার এরপর গণ-উৎসবের দিন বলেই ধরা হোক।

আমি কোনদিন শহীদ মিনারে যাইনি:....

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের সঙ্গে

চিত্রিতার সাক্ষাৎকার

একাকী বসে আঁধারের রূপ প্রত্যক্ষ করছিলেন তিনি। জীবনের কোলাহলের মাঝে হয়তো আর কোন প্রাণস্পন্দন খুঁজে পাননা। এক বাঙলার রাজনীতির বিতর্কিত নায়ক জনাব নূরুল আমিনকে দেখে সেকথাই মনে হয়েছিলো। স্মৃতি এখনতার মুখমণ্ডলে আর অভিব্যক্তিতে কথা বলছে। কিন্তু স্মৃতি রোমন্থন করতে চাননা তিনি, হৃদয় খুঁড়ে হয়তো বেদনা জাগাতে ভাল লাগেনা। তাই বলছিলেন "এ প্রশ্নের জবাব আমি অনেক আগেই দিয়েছি। আমার বইতেও একথা বলেছি। এ সম্পর্কে নতুন করে বলবার আর কি আছে" তবুও আমাদের এড়াতে পারেননি। কথা তিনি বলেছেন. নতুন করেই বলেছিলেন।

ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন তিনি একুশের দিকে। আমরা প্রশ্ন করেছিলাম,

: একুশে ফেব্রুয়ারীতে গুলী চালনার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

আমি সে সময় পরিষদেই ছিলাম। একটু সময় নিয়ে আপনমনে বললেন, গুলী চালনার আগমুহুর্তে ও আমি জানতামনা। শেষ হয়ে যাবার পর অবশ্য আমাকে শুধু বলা হয়েছিল ঘটনাস্থলে যাবার জন্য। আমি যাইনি। তখন আমি ঘটনার তদন্ত করবার জন্য তদন্ত কমিশন গঠন করবার কথা চিন্তা করছিলাম। সে তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল বিচারপতি টি. এইচ, এলিসের নেতৃত্বে। কমিশনের রিপোর্ট পাওয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে কোন মন্তব্য করা উচিত বলে আমি মনে করিনি। অবিশ্যি তদন্ত কমিশন গুলীর স্বপক্ষেই রায় দিয়েছিলো।

: সেদিন কি পরিষদে এই ঘটনার নিন্দা করে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিলো?

: নিন্দা করে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়নি। পরদিন আমি প্রস্তাব করেছিলাম দুঃখজনক ঘটনার সাথে রাষ্ট্রভাষার কোন সম্পর্ক নেই। আইন শৃংখলা বজায় রাখবার জন্যই গুলী করা হয়েছিলো।

: আপনি কি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দুকে সমর্থন করতেন?

: আমি কোনদিন রাষ্ট্রভাষা উর্দু সমর্থন করিনি।

: তাহলে বায়ান্নর আগে জিন্নার বক্তৃতার প্রতিবাদ করেননি কেন— আমি এই অংশের মুসলিম লীগ সদস্যদের কথাই বলছি।

: আমরা প্রতিবাদ করিনি এই জন্য যে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারটা আইন-পরিষদে তখনো উত্থাপিত হয়নি। আমরা যখন শাসনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য পেশ করতাম তখনই এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতো। কারণ রাষ্ট্রভাষা কোন বিচ্ছিন্ন জিনিষ নয়, এটা শাসনতন্ত্রের একটা অংশ মাত্র।

: পল্টন ময়দানে খাজা নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতা শুনে আপনার কি মনে হয়েছিলো?

: নাজিমুদ্দীনের কথা শুনে অসন্তুষ্ট হয়েছি। তবে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিনি কারণ আমরা একই পার্টিতে ছিলাম। নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতার জোর আগমুহুর্ত ও আমি একেবারে অনবগত। পরে এ নিয়ে যখন হৈ চৈ শুরু হয় তখন নাজিমুদ্দীন সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন এটা তার নিজের কথা নয়। কায়েদে আজমের বক্তব্যের তিনি প্রতিধ্বনি করেছেন।

: একুশে ফেব্রুয়ারীতে গুলী চালনার জন্য কি আপনি কাউকে দায়ী করেন?

: একুশে ফেব্রুয়ারীতে গুলী চালাবার জন্য আমি কাউকে দায়ী করিনা। প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী বললেন, কমিশনের রিপোর্ট কাউকে দায়ী করেনি।

এরপর আমরা আঘাত করলাম তার হৃদয়ের দুর্বলতম স্থানে। পূর্ব বাঙলার মানুষের স্বাধিকারের প্রতীক, যার পদতলে এসে পূর্ব বাঙলার মন্ত্রেরা নতুন জীবনের শপথ গ্রহণ করে. যে মিনার আমাদের বিবেককে জাগ্রত করে প্রতিক্রিয়ার আরশোষণের বিরুদ্ধে। বাঙলা দেশের মানুষ যারা ঢাকায় থাকেন বা বেড়াতে আসেন শহীদ মিনারটা তারা দেখে যান পবিত্র তীর্থের মত। জিজ্ঞেস করলাম,

: আপনি কি কখনো শহীদ মিনারে গেছেন? তিনি মুখ তুলে তাকালেন। বিভ্রান্ত মনে হল মুখটা। বললেন, আমি কখনো শহীদ মিনারে যাইনি একটু থেমে আবার বললেন. দূর থেকে দেখেছি শহীদ মিনারকে। কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঠিক যাইনি।

: একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের জন্য এক সময় আন্দোলনকারীদের ভারতীয় এজেন্ট ও কমুনিষ্ট বলা হতো আপনি কি এর সাথে একমত?

বিষন্ন লাগছিল তাকে। এবার একটু সোজা হয়ে বসলেন.

: আমি তখন আমার এক বক্তৃতায় ভারতের 'স্বাধীনতা' পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে একথা বলেছিলাম। আমার অবিশ্বাস করার কি কারণ আছে?

: শেখ মুজিবর রহমান কিছুদিন আগে বলেছেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেই বাঙলা চালু হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে আপনার মত কি?

: ভালই হবে। কথায় কথায় তো একথা সবাই বলে। বাঙলা রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পাবার পরও মুজিবরের দল ক্ষমতায় ছিলো। তখন তো কিছুই হয়নি। আমিও দেখতে চাই বাঙলা চালু হয়েছে অফিসে আদালতে— আমাদের জীবনযাত্রায়।

: জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাঙলার প্রচলন কিভাবে সম্ভব.

: বাঙলা চালু করে দিতে হবে। অন্যান্য অজুহাত অচল। চালু করার পর অসুবিধে হলে আপনা আপনি পরিভাষা সৃষ্টি হবে।

: রবীন্দ্র সাহিত্যকে যে বেআইনী করবার কথা উঠেছিল সে সম্পর্কে আপনার মত কি?

: সাহিত্য হচ্ছে সার্বজনীন। সাহিত্যের সমান মর্যাদা দেয়া উচিত। যার যা মর্যাদা তাকে তা দিতেই হবে। এ সব প্রশ্নের উত্তর তিনি হাসি মুখে দিয়েছেন। উঠে আসবার আগে আমরা তাকে প্রশ্ন করেছিলাম.

: একুশে ফেব্রুয়ারীতে যখন আপনার বিরুদ্ধে স্লোগান উঠতো এখনো বক্তৃতায় গালি দেওয়া হয় তখন আপনার কেমন লাগে?

: খারাপ লাগে না। আমি মনে করতাম লোকে আমাকে ভুল বুঝেছে। ওরা সত্য কথা জানেনা। অনেকের জীবনেই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।

অনুমান করতে পারি. পুরো ঘটনাকে তিনি এভাবেই বিচার করে নিজের বিবেককে সান্ত্বনা দেন।

এরপর আমরা কোন প্রশ্ন করিনি। চলে আসবার আগে তিনি আমাদের দিয়েছিলেন তার সেই ছোট্ট পুস্তিকাটি —"যে কথা এতদিন বলিনি।" এর বাইরেও তিনি অনেক কথাই বলেছেন, যা এ পুস্তিকায় ছাপাতে পারেননি।

জীবনের চাঞ্চল্যকর ও
স্মরনীয় মুহুর্তগুলো

Agfacolor

সিএনএস ফিল্‌ম-এ
ধরে রাখুন

এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যেই আপনার
রঙ্গীন ছবি নিয়ে নিন।

সি এন এস—স্বাভাবিক
রংয়ের ফিল্‌ম।
আগ্‌ফা-গ্যাভার্ট পাকিস্তান
লিমিটেডের তৈরী রঙ্গীন
ছবির খরচ খুবই কম অর্থাৎ
পোষ্ট কার্ড সাইজের ছবির
জন্যে মাত্র তিন টাকা
খরচ পড়ে।

মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের মরণ কামড়

সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মার্কিনী রণনীতি নতুন মোড় নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর নিজের সেনাবাহিনীকে রণক্ষেত্রে ব্যবহার করতে প্রস্তুত নয় এখন মুক্তিবাহিনীর হামলার মুখে শিকার হচ্ছে ইন্দোচীনের তাঁবেদার সরকারের সেনাবাহিনী। ভিয়েতনাম যুদ্ধকে ভিয়েতনামী-করণের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিকে স্বদেশের বিক্ষোভকে প্রশমিত করতে চাইছে অপরদিকে আক্রান্ত দেশগুলোর জনগণের মধ্যে বিভক্তিকরণকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁবেদার সেনাবাহিনীর বিজয়কে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবধরণের আধুনিক মারণাস্ত্র দিয়ে সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করে তুলেছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধ ভিয়েতনামীকরণ অর্থাৎ সায়গন বাহিনীকে সামনে রেখে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হলে বেপরোয়া

নিকসন

লন নল

বোমাবর্ষণের মাধ্যমে উত্তর ভিয়েতনামকে ধ্বংস করবার হুমকিও দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট নিকসন—বলেছেন প্যারিস শান্তি আলোচনায় আমরা উত্তর ভিয়েতনামীদের আর কোন সুবিধে দেবনা। তাদের জন্য নিক্সনের এই হুমকি ইন্দোচীন সমস্যা সম্পর্কে মার্কিন মনোভাবকে আমাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। নিক্সনের আসফালন থেকে জবাব মিলেছে সেইসব প্রশ্নের—কেন ভিয়েতনাম যুদ্ধের সীমা লাওস ও কম্বোডিয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে, কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্যারিস শান্তি আলোচনায় যেতে রাজী হয়েছিল।

মুক্তিবাহিনী

মার্কিন সরকার এমন একসময় প্যারিস শান্তি আলোচনায় রাজী হয়েছিল যখন মুক্তিবাহিনীর আক্রমনের মুখে মার্কিন ও সায়গন বাহিনী হিমসিম খাচ্ছে, যখন ডলারের মূলমান হ্রাস পাচ্ছে আর স্বদেশে যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভ তুমুল আকার ধারণ করেছে। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জনসন আংশিক বোমাবর্ষণ বন্ধের কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেদিন একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ভিয়েতনামে ছয়লক্ষাধিক মার্কিন সৈন্য পুষে এবং যদ্ধের সকল ব্যয়ভার বহন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভবপর ব্যাপার নয়। বিশেষ করে মার্কিন জনগন যখন তা করতে রাজী নয়।

এই পটভূমিতেই প্যারিস শান্তি আলোচনা শুরু হয়েছিল। শান্তি বৈঠকের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সুবিধা রেখেছেন তা হলো যুদ্ধের তীব্রতা কমেছে এবং যুদ্ধের ব্যয় বাহুল্যাংশে হ্রাস পেয়েছে! মার্কিন সরকার তাদের জনগন ও বিশ্বজনগনকে বিভ্রান্ত করেছেন। যুদ্ধের তীব্রতার সুযোগে উত্তর ভিয়েতনাম সরকার পুর্নগঠনের কাজে হাত দিয়েছিলেন। একই সময়ে সেখানে অন্য একটা পরিবর্তনও হয়েছে। তাহলো ভিয়েতনামী জনগনের প্রতীক হো চি মিনের আকস্মিক মৃত্যু। গোটা পরিস্থিতির সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র ইন্দোচীনে যুদ্ধ সম্প্রসারণের এই নতুন পরিকল্পনা তৈরী করেছে।

ইন্দোচীনে মার্কিনী হামলার দ্বিতীয় শিকার কম্বোডিয়া। প্রিন্স সিহানুকের দোদুল্যমনতার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়েছে কম্বোডিয়ায় হামলা সম্প্রসারিত করা। একদিন মার্কিনী চাপের কাছে নতিস্বীকার করে সিহানুক লন নলকে নিয়োগ করেছিলেন। লন নলের ডানপন্থী ভূমিকা সিহানুকের অজানা

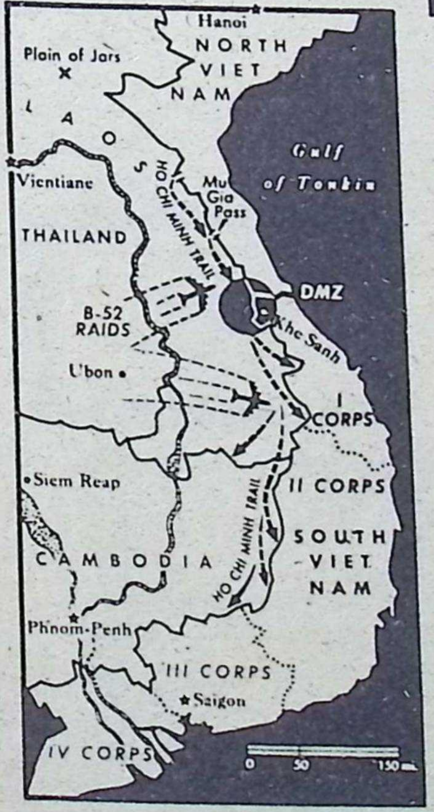

ছিল না। সিহানুকের দুর্বলতার সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কম্বোডিয়ায় অধিষ্ঠিত করেছে লন নল চক্রকে। পরবর্তী পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর গোপন ঘাটি ধ্বংসের নামে চলেছে সায়গন ও মার্কিন বাহিনীর কম্বোডিয়ার ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ। সিহানুক অবিশ্যি এ হামলার মুখে নতিস্বীকার করেননি। জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের মধ্য দিয়ে সিহানুক শুরু করেছেন মার্কিন বিরোধী সরকার।

কম্বোডিয়ার পর মার্কিন সরকারের তাবেদার বাহিনী হামলা চালিয়েছে লাওসে। লাওসের নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত জেনেভা চুক্তি মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। মার্কিন সরকার এটা ভাল করেই জানে প্যাথেটলাও বাহিনীর ক্ষমতা হ্রাস করতে না পারলে ফুমা সরকারের নিশ্চয়তা বিধান করা যাবেনা। আর প্যাথেটলাও বাহিনীও মুক্তিবাহিনীর ক্ষমতা হ্রাস করতে হলে প্রয়োজন হো চি মিন সড়ক দখল। হো চি মিন সড়ক দখল কি দুঃসাধ্য ব্যাপার বিগত বছর গুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা উপলব্ধি করেছে।

ফুমা

এবার তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্রশক্তি নিয়োগ করেছে হো চি মিন সড়ক দখল করবার জন্য।

কম্বোডিয়া ও লাওসে সামরিক অভিযানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সায়গন সরকারকে নিশ্চিহ্ন করা। এ দুটি রাষ্ট্রে তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত করা এবং সর্বোপরি মহাদেশীয় রণনীতির বিজয়ের জন্য গণচীনের প্রতি হুমকি প্রদর্শন করা।

কোরিয়ার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আর বর্তমান যুদ্ধের পরাজয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে মার্কিন সন্তানদের রক্ত ঝরতে থাকলে স্বদেশের জনগন তা সহ্য করবেনা। তাছাড়া আভ্যন্তরীণ সংকট কাটিয়ে উঠতে হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেশীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আরো মনোযোগী হতে হবে। কিন্তু সায়গন বাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয় মুক্তি বাহিনীর আক্রমণের মোকাবিলা করা। তাই মার্কিনী পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিনী বিমান বোমাবর্ষণ করবে আর উপদেষ্টারা উপদেশ বিলাবেন। রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করবে ভিয়েতনাম বাহিনী। এশিয়ার জনগণকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফায়দা তুলবার পরিকল্পনা করেছেন মার্কিন সরকার।

মার্কিন সরকারের এই নীতি কতখানি

সাফল্য লাভ করবে সে সম্পর্কে এখনই কিছু বলা যায় না। কারণ দক্ষিণ-ভিয়েতনামে ব্যর্থ হয়ে গেছে প্রতিটি মার্কিনী রণকৌশল। সেখানে উপদেষ্টার সংখ্যা দেড় হাজার থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছিল পাঁচ লক্ষে। শহর ও গ্রামগুলোকে পরিণত করা হয়েছিল দুর্গে। মুক্তি-বাহিনীর প্রচণ্ড অভিযানের মুখে ভেঙ্গে পড়েছে সব ঘাটি—নিহত হয়েছে হাজার হাজার মার্কিন 'উপদেষ্টা'। এর বাইরেও রয়েছে গণচীনের সক্রিয় অংশগ্রহণ। একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে গণচীন যদিও শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী সেজন্য গণচীন কারো আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না কিন্তু যখনই গণচীনের জাতীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হবে বা কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ আক্রান্ত হবে, তখন গণচীন আর চুপ করে বসে থাকবেনা। গণচীনের এ ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল কোরিয়ার যুদ্ধে, যেদিন ম্যাকআর্থারের নেতৃত্বে মার্কিন বাহিনী আটত্রিশ প্যারালাল অতিক্রম করেছিল। ইন্দোচীনের যুদ্ধে গণচীনের সক্রিয় অংশ গ্রহণের (physical involvement) প্রতিক্রিয়া কি পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা ভালো করেই জানে।

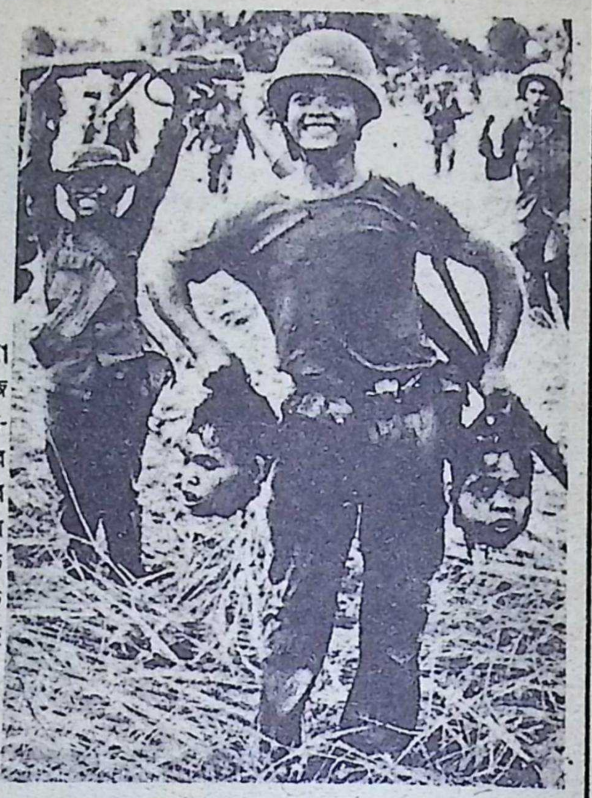

সভ্যতার দাবীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৃশংসতার কথা আজ আর কারো অজানা নেই। সমগ্র ইন্দোচীন জুড়ে আজ মার্কিনী সৈন্যের সহায়তায় তাবেদার বাহিনী মুক্তিকামী জনতার উপর যে নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে ইতিহাসে এর তুলনা নেই। আজ ইন্দোচীনের পথে প্রান্তরে শুধু মৃত্যুর পদধ্বনি। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ভিয়েতনামী-করণের মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হত্যাকারীর অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। বিভ্রান্ত করতে চায় বিশ্ব-জনমতকে। মার্কিন রণনীতি আজ ইন্দোচীনে সাফল্য অর্জন করছে। আজ সেখানে চলছে আত্মঘাতী সংগ্রাম। সে আত্মঘাতী প্রচেষ্টায় কম্বোডীয় সেনাবাহিনীর শিকার হচ্ছে কম্বোডীয় জনগণ। প্রতিটি মৃত্যুর উল্লাসে কম্বোডীয় তাঁবেদার সেনাবাহিনী উল্লসিত। কিন্তু কে জবাব দেবে এই হিংস্র বর্বরতার?

মার্কিন সরকার যে সত্যকে বুঝতে চাইছেন না, বা বুঝলেও অন্যকে বুঝতে দিতে চাইছেন না, তা হলো এ যুদ্ধের পেছনে ইন্দোচীনের জনগণের সমর্থন নেই। তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তার ফলাফল নিশ্চয়ই মার্কিন সরকারের পক্ষে যাবেনা। পেন্টাগণের নীতি নির্দ্ধারকরা এই সত্যকে উপলব্ধি করছেন না বলেই তারা বুঝতে পারছেন না ইন্দোচীনের জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধকে থামিয়ে দেয়া যাবেনা। বোমাবর্ষণের মাধ্যমে গ্রাম জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও প্রতিরোধ যুদ্ধে তারা জয়ী হবে না। গোটা ইন্দোচীনকে যদি জনশূন্য করবার পরিকল্পনা মার্কিন সরকারের থেকে থাকে তাহলে তারাই বা কি ভাবে লাভবান হবেন? যে রণনীতির ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোচীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তাতে ইন্দোচীন জনশূন্য হয়ে পড়বার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায়না।

প্রেসিডেন্ট নিকসনের হুমকী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষকে উৎকণ্ঠ করে তুলছে। ইন্দোচীনে যুদ্ধ সম্প্রসারিত হতে থাকলে একসময় গোটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সে যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়বে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন কয়টি রণক্ষেত্রে যুদ্ধ চালাবেন। আজ যে তিন রণক্ষেত্রে মার্কিন সরকার যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছেন তা হলো মধ্যপ্রাচ্য, ইন্দোচীন এবং স্বদেশ। এই তিন রণক্ষেত্রের বাইরে যুদ্ধ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা তাদের জন্য মরণকামড় হয়ে দাঁড়াবে। মার্কিন সরকার হয়তো ধ্বংসমুখী সভ্যতাকে রক্ষা করবার জন্য সেই মরণকামড়ই দিয়েছেন। এ লড়াই একসময় গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। বিশ্বের জনগণ আর দেশীয় জনগণের প্রতিরোধের মুখে একদিন মার্কিন সরকারকে নতি স্বীকার করতেই হবে। তাদের এ পরাজয় সুনিশ্চিত।

ওদের নতুন ফ্যাশন

এক তন্বী যুবতী পার্টিতে এলেন। যুবতীর পরনে হাঁটু ঢাকা কোট, উঁচু জুতো, ফারের তৈরী হ্যাট এবং হাতে দস্তানা। তবু, যুবতী ঠাণ্ডায় কাঁপছে। যুবতী পা ঝেড়ে জুতোর উপর জমে থাকা বরফ ফেলে দিলেন তার পর কোটটিও খুলে ফেললেন যথারীতি। এবার কাঁপুনী ধরেছে দেখা গেল উপস্থিত আমন্ত্রিতদের। খুবই স্বাভাবিক ব্যাপারটা—কেননা, সবাই দেখতে পেলেন, যুবতী এই শীতার্ত রাতে শুধু সর্টস পরে পার্টিতে এসেছেন। কাঁপুনী ধরানো এই নতুন পরিচ্ছদের নাম কিন্তু হট-প্যান্ট—নামটা অবশ্যই ভাবব্যাচক। ৭০ সালের ফ্যাশন জগতে মিনি-মিডিকে পদানত করে এরই জয়জয়কার হবে বলে অনেকে বলছে। বিয়ের কনে থেকে তরুণী মায়ের জন্যে হটপ্যান্টসের চলন শুরু হয়েছে।

নিউ ইয়র্কের ম্যানহ্যাটানের বোটিক মালিক জিমি ইর্ক হট-প্যান্টস সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন: "এই বস্তুটি মহিলারা যে হারে ক্রয় করছেন এবং পুরুষ চিত্তে যে প্রতিক্রিয়া ঘটছে তা দেখে মনে হচ্ছে পুরুষেরা দশ সাল নয়, যেন দশ বছর কোনো অনাবৃত্তা পা দেখেননি।" (গত দশ সাল মিডির যুগ বলা হয়েছে)

হট-প্যান্টস ভক্তদের তালিকায় হলিউডের অনেক প্রধান তারকার নাম সংযোজিত হয়েছে। এদের মধ্যে সবচে উৎসাহী হচ্ছেন: উরসুলা এ্যান্ড্রেস ও র‍্যাকুয়েল ওয়েলচ। ওয়েলচ আবার লোকেশনে ফিল্ম স্যুটিং চলার সময় পরার জন্য বাড়তি কয়েকটি সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

জ্যাকি ওনাসিসও ইয়টে পরার জন্য ডিজাইনার বেটসী জনসনের তৈরী কয়েকটি হট-প্যান্ট কিনেছেন। আর এক মহিলা, জ্যাকুই নেলসন অফিসে হট-প্যান্টস পরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন—কর্তৃপক্ষ তার আবেদন মঞ্জুর করতে বাধ্য হয়েছেন।

ইউরোপ-আমেরিকার বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা ডিজাইনার এই হট-প্যান্টস তৈরীতে মনোযোগী হয়ে উঠেছেন এর প্রচণ্ড চাহিদা দেখে। এদের মধ্যে সিরজিও ডি সেইন্ট এ্যাঞ্জেলো, ফ্যাসা কুইয়েরো, ভ্যালেন্টিনো রুডি, গেরনরেইলের মত বিখ্যাত নামও রয়েছে।

হট-প্যান্টস সম্পর্কে নানা জনে নানা কথা বলছেন। এক নর্তকী বলেছেন, "এর প্রধান সুবিধা হচ্ছে, হাঁটু নিয়ে বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয় না।" লণ্ডনের এক মডেল বলেছেন, "এটা পরে যে ভাবে ইচ্ছা হাঁটা চলা যায়। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় রসিক পুরুষদের উক্তি শুনতে হয় না।"

টেলিভিশন অভিনেত্রী মারলো টমাস

রবার্ট ষ্ট্যাকের স্ত্রী

বিয়েরও পোশাক

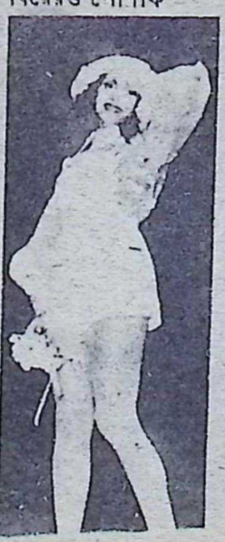

অভিনেত্রী এলসা মার্টিনেলি

তৃতীয় নয়ন

তমিস্রা

সময়ের কাঁটা নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরে চলে তবু মনে হয় দিনগুলি যেন অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ধরি ধরি রাখি রাখি তার আগেই যায় ফুরিয়ে। সময়ের স্রোতে ঝরা পাতার মত একটি একটি করে বছর খসে যায় আয়ু থেকে আর মন গুমরে গুমরে ওঠে বেদনায়।

কিন্তু এই আসা যাওয়ার পালাই চিরন্তন এ জগতে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলে জীবন, আর তাই আসা যাওয়ার আনন্দ বিরহ হাসি-কান্নার সব কিছুর ভেতরেও মানুষ বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে আশা নিয়ে।

আজ যাবে আবার আসবে কাল। দিন গেলে আসবে সন্ধ্যার বিষণ্ণতা, তবু আগামীকাল উঠবে সোনালী সূর্য এইতো মানুষের আশা। যা চলে যায় তা ফিরে আসেনা, এ কথা সত্য নয়। যা চলে যায় তা দিয়ে যায় অনেক অভিজ্ঞতা, তারই মধুময় স্মৃতি মনে সঞ্চয় হয়ে থাকে। আর নতুনের প্রতীক্ষায় আবার উন্মুখ হয় মন। সে নতুন জীবনের মন্ত্র বয়ে আনে অতীতের অভিজ্ঞতায় দেয় সামনে চলার প্রেরণা। এইতো জীবনের ধর্ম।

সেই নতুনের বার্তা নিয়ে শীত শেষে এসেছে বসন্ত। রূপ বর্ণ বিবর্জিত দিনগুলিতে নিয়ে এসেছে অপরূপ বর্ণ বৈচিত্রের সম্ভার, মেঘমুক্ত নীলাভ আকাশ আর ফুলের মত বর্ণছটার মাধুর্য।

কিন্তু শুধু আনন্দেরই নয়, রোদন ভরা এ বসন্ত বহন করে এনেছে এক বেদনামিশ্রিত গৌরবেরও স্মৃতি। তবুও এ স্মৃতি পিছনে টানেনা, এগিয়ে দেয় আগামী দিনের সম্ভাবনা আর সার্থকতার পথে। পূর্ববাঙলার বসন্ত ফিরে এসেছে, সাথে নিয়ে এসেছে সেই রক্তঝরা একুশে ফেব্রুয়ারী। প্রতি বছরের মতই সে এসেছে নতুন প্রতিশ্রুতি আর প্রেরণার বাণী নিয়ে।

একুশের প্রেরণায় যে চেতনা, যে নতুন বোধের উন্মেষ হয়েছে বাঙালীর মনে, তার স্মৃতি এ দেশের মানুষ কোনও দিনও ভুলতে পারে না, ভুলবে না।

মহান একুশের তাৎপর্য এ দেশের মানুষের জীবনে অনেক ব্যাপক, অনেক সুদূরপ্রসারী। একুশের রক্তাক্ত সংগ্রামের দর্পনেই তো এ দেশের মানুষ তার আপন স্বরূপকে প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিল, বলিষ্ঠ আত্মত্যাগের ভেতরেই খুঁজে পেয়েছিল জীবনের পরম সত্য। শুধু সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাই নয়, অত্যাচার, অন্যায় নিপীড়ন, গণস্বার্থ বিরোধী সকল কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে তাদের মনে মূর্ত প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে চিরচিহ্নিত হয়েছিল এই দিন।

তাই প্রতি বছর যখন বসন্তের পুষ্পিত পথ বেয়ে ফিরে আসে স্মৃতিময় একুশে ফেব্রুয়ারী অশ্রুসিক্ত নয়নে বেদনাভারাক্রান্ত মনে এদেশের মানুষ তাকে স্মরণ করে হৃদয়ের গভীর অন্তরঙ্গতায়। উনিশ বছর পর সেই অতীত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আত্মবিশ্লেষণে প্রখর হয় আজ সচেতন মানুষের মন। তলিয়ে দেখতে চায় অন্তরের অন্তঃস্থলের গভীরে। মনে জাগে সকলের বিরাট জিজ্ঞাসা—মৃত্যুঞ্জয়ী বীর শহীদদের আত্মোৎসর্গের মূল্যে যে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে তা কি শুধু আবেগ অনুভূতি আর সপ্তাহব্যাপী অশ্রুপাতের ভেতরই ধীরে ধীরে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? প্রতি বছরই কি শুধু গতানুগতিক প্রথায় একুশে বরণের পালা চলবে আর চলবে? সভা সমিতি বক্তৃতা আর পুষ্পাঞ্জলির ভেতরেই কি সীমায়িত হবে এই মহাদিনের স্মৃতিচারণ?

উনিশ বছর ধরে স্মৃতি চারণের নামে আমরা কি করেছি? ভাষা সংগ্রামের মর্যাদা কতটুকু রক্ষা করেছি? আজও কি আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে, সরকারী দফতরে জীবনের সর্বস্তরে বাঙলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি? আজও কি আমাদের শিল্পে সাহিত্যে বাঙলা ভাষার আন্দোলন যথার্থভাবে রূপায়িত হয়েছে? এ সংগ্রামকে সার্থক করে তুলতে এদেশের বুদ্ধিজীবিরাই বা কি ভূমিকা পালন করেছেন? এ দেশের লেখক সাহিত্যিকরা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে কতদূর কৃতকার্য হয়েছেন? ছিটে ফোটা কবিতা, টুকরো টুকরো প্রবন্ধ আর তুচ্ছ গল্প কাহিনীর ভেতরেই আমাদের ইতিহাসের এই মহাসংগ্রামকে আমরা নামমাত্র স্বীকৃতি দিয়েই কি ক্ষান্ত হইনি?

একুশে ফেব্রুয়ারীর নামে এই দীর্ঘ সময় আমরা শুধু পালন করে এসেছি আত্মপ্রবঞ্চনার এক নির্লজ্জ ভূমিকা।

সাধারণ মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে পরিচালিত করেছি প্রান্ত শূন্য পথে। আমাদের বুদ্ধিজীবিরা, যাঁরা অমিত অভিমানে চির উদ্ধত, তারা দিন, দেউলে, সর্বস্বান্ত, আশাহীন, ভাষাহীন। স্মৃতিরোমন্থনের বিলাসিতায় একুশের সংগ্রামকে চিহ্নিত করেই তারা বিধ্বস্ত, ক্লান্ত

তাই বুঝি ভাষা সংগ্রামের মহান প্রেরণাও এদেশের লেখক সাহিত্যিকদের উদ্বুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। একুশের আন্দোলনকে চির স্মরণীয় করে রাখতে আজ পর্যন্ত কোনও সার্থক নাটক, উপন্যাস গল্প গাথা কাহিনী কিছুই রচিত হয়নি। এমনকি গণজীবনে যার প্রভাব সবচাইতে বেশী সেই শিল্প মাধ্যম চলচ্চিত্রেও আমরা একুশে ফেব্রুয়ারীর কোনও সার্থক রূপায়ণ দেখিনি। আমাদের চিত্তবিনোদনের বড় বাহন বেতার টেলিভিশনের জ্ঞানী গুণী মহারথীদের কথাতো ছেড়েই দিলাম। এই দিবসের স্মরণে অনুষ্ঠান প্রচার করা দূরে থাক, কোনও রকম স্বীকৃতি দিতেই তাদের বুক ভয়ে কেঁপে উঠেছে।

এই যদি সত্য হয় তবে আর ঘটা করে জাঁকজমকের সাথে এ স্মৃতি পালনের প্রহসন কেন?

পরিশেষে তবু আমরা একথাই বলবো, একুশে ফেব্রুয়ারীতে আর বেদনার অশ্রু ফেলা নয়, নয় সঙ্গীতে স্মৃতিচারণ। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারে নতুন পথে নতুন শপথ নিয়ে এগিয়ে যেতে হলে চাই দ্বিধাহীন নির্ভীক মন। যে মন খুঁজে নেবে আত্মমুক্তির পথ। ভাবাবেগ মুক্ত বাস্তব পদক্ষেপে অমর একুশের স্মৃতিকে দৃষ্টান্ত করে তুলবে আপন দৈনন্দিন জীবনে।

চিত্রিতার মতো একটা সর্বাঙ্গ সুন্দর পত্রিকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

—ধন্যবাদ গৃহীত হল।

*কিছুদিন পূর্বে আমৃত্যু বাসনা নাম দিয়ে যে একটি কবিতা পাঠিয়েছিলাম তার কোন খোঁজ খবর দিতে পারেন কি?

—নির্বাচিত কবিদের কবিতাই আপাতত প্রকাশ করবো। অতএব...

রূপক, ঢাকা—৮

*মানুষতো একদিন এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে! তবুও কেন মানুষ পৃথিবীর বুকে সুন্দরকে এত ভালবেসে যাচ্ছে? এতে তার কি লাভ?

—লাভ? নব্য-দার্শনিকদের মাথায় কিছু আরশোলা ঢোকানো ছাড়া লাভটাভ তো তেমন কিছু দেখছি না।

বাউল, কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

*সমাজ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে বীটল, হিপ্পী ও প্রাচ্যের বাউল সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ কী?

—প্রভেদ সাদাকালোর, প্রভেদ নকল আসলের! ওরা স্বার্থের সাধক, বাউলরা সাধনার সাধক।

*বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় আপনার মতে সবচেয়ে বড় সংকট কি?

— মার্কিনদের অস্তিত্ব।

প্রশ্ন পাঠাবার ঠিকানা: উত্তরদাতা,
প্রশ্ন ও উত্তর: চিত্রিতা
৬৮।২ পুরানো পলটন ঢাকা-২

ইনামুল কবীর
ঢাকা—৯

* আমার মতে ভারতীয় ছায়াছবি পাকিস্তানে প্রদর্শিত হওয়া উচিত। আপনার মতামত জানাবেন।

—ভারতীয় ছবি মনে যদি হয় হেলেনের নাচ আর সোনিয়া সাহানার বিকিনি তবে আমার উত্তর না। তবে বাছাই ছবি বিনিময়ের মাধ্যমে আসতে পারে।

* দর্শকদের ভাল লাগার থেকেই জন্ম নেয় ভাল ছবি তৈরীর প্রেরণা, তাই নয় কি?

—এত 'ভাল' 'লাগা' এক হওয়া খুব সহজ নয়। তবে পৃথিবীতে ভাল চলচ্চিত্র নির্মাতা ভাল দর্শক তৈরী করে নেন। অনেক সময় একা একাই।

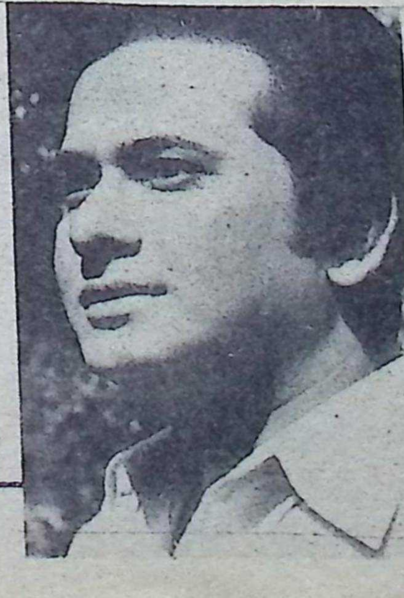

চৌধুরী ফজল বারী
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা।

* আচ্ছা সেই পুরানো মরাবাঁধা বা রাজরাণীর কাহিনী থেকে কি বাংলার চলচ্চিত্রাঙ্গন গণমুখী হবে না। আসুন না প্রার্থনা করি এ অঙ্গনে একটা প্রচণ্ড ঝড়ের জন্য, যেমন দেশের রাজনীতিতে বয়ে গেছে।

—প্রার্থনায় কাজ হলে জামাত তলিয়ে যেতো না। ঝড় তুলতে হলে আপনাকেই তুলতে হবে।

* আজকাল ঢাকা টেলিভিশনের কতগুলো অনুষ্ঠান ভাল লাগছে, কিন্তু বেতারের প্যানপ্যানানির আদৌ পরিবর্তন আসবে কি?

—ওটাকে ভূত তাড়ানো ঘুম ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে একেবারে বাতিল না করে। এটা বেতারে শুভার্থী আমার এক বন্ধুর মত

গাফল্য লাভ করবে সে
কিছু বলা যা

সকালের আগে চলেছি আমরা

সমগ্র পাকিস্তানে আমরাই একমাত্র বিস্কুট প্রস্তুতকারী যারা উৎকৃষ্ট মানের জন্য পাকিস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড ইনস্টিটুশন কর্তৃক সম্মানিত। আমরা দেশের সর্ববৃহৎ বিস্কুট প্রস্তুতকারীও বটে। এরপর.? পরের কথা পরে। এখন আমরা এই টুকুই জানি যে, আমরা সবার আগে চলেছি এবং আমাদের এ অগ্রগতি অব্যাহত রাখতেই হবে।

NABISCO

নবিস্কো বিস্কুট এ্যাণ্ড ব্রেড ফ্যাক্টরী
ঢাকা—পূর্ব পাকিস্তান
নবিস্কো বিস্কুট পরিপূর্ণতার প্রতীক।

NB—4/70 EAST ASIATIC

প্রতি মাসেই পুলিশ এবং ক্রেতার মধ্যে এই পত্রিকাটি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে—ক্রেতারা পুলিশ বাজেয়াপ্ত করার আগেই এটি সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হন আর পুলিশ চায় ক্রেতাদের হাতে এটা পৌঁছবার আগেই আটক করতে

প্লেবয় নয় প্লেমেন

মার্কিন প্লেবয় পত্রিকার ইতালীয় সংস্করণ হচ্ছে প্লেমেন পত্রিকা। ইতালীতে হিউ হেফনারের ভূমিকা পালন করছেন এক স্বর্ণকেশী মহিলা। নাম তার অ্যাদেলিনা তাত্তিলো। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তিন সন্তানের জননী।

অ্যাদেলিনা প্লেমেন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাত্রী এবং প্রকাশিকাও। মার্কিনী প্লেবয় পত্রিকার মত প্লেমেনেও নগ্নিকা নারীদের ছবি দেদার ছাপা হয়। আর কিছু নিবন্ধ। নিবন্ধগুলো পাতা ভরানোর কাজ করে মাত্র। ওগুলো কেউ পড়ার কষ্ট স্বীকার করে বলে মনে হয় না।

গত চারবছরে এই পত্রিকার প্রচারসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫০,০০০। পত্রিকাটির প্রতি পুলিশের নেকনজর পড়ার ফলেই এর প্রচারসংখ্যা আকাশচুম্বী হতে পেরেছে বলে ধারণা করা হয়।

পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যা অবাক করার মত। কেননা, আমাদের দেশীয় মুদ্রায় এর মূল্য দাঁড়ায় প্রায় পাঁচ টাকা। ইতালীতে লাইফ-এর অনুকরণে একটি পত্রিকা বের হয়। তার দাম মাত্র দু'টাকা। প্রচার সংখ্যা ৩৫০,০০০। এই ধরণের আর একটি পত্রিকা—ওগ্গি (প্রচারসংখ্যা ৯৫০০০) দাম মাত্র দেড় টাকা।

শুরুতে প্লেমেন বড্ড বেশী প্লেবয় ঘেঁষা পত্রিকা ছিল। সামান্য কিছু পরিবর্তন ছিল অবশ্য। যেমন, প্লেমেন পত্রিকার গার্ল অব দি মান্থ সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হলেও বুকের উপর হাত ঢেকে রাখতো।

গত বছর থেকে প্লেমেন নিজস্ব একটা ধারা বেছে নিয়েছে। প্লেমেনে যে সব নগ্নিকা মেয়েদের ছবি ছাপা হয় তারা কেউই কিশোরী বা তরুণী নয়, তারা রীতিমত রমনী। ইংরেজী ওম্যান শব্দটি তাদের বেলায় নির্দ্বিধায় প্রয়োগ করা চলে। প্লেমেন ইউরোপীয় রুচির পৃষ্ঠপোষক। ইউরোপের লোকেরা আমেরিকানদের মত 'ম্যামারি অবসেসন'-এ ভোগে না। সুতরাং অতি উন্নত অথবা অতি-বড় স্তনবিশিষ্টা রমনীর ছবি প্লেমেনে সচরাচর ছাপা হয় না।

তাত্তিলো বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাতৃতান্ত্রিক প্রধান দেশ। ওখানকার পুরুষদের অতি উন্নত অথবা অতি বড় স্তনের প্রতি দুর্বলতার এটাই বোধকরি সবচেয়ে বড় কারণ। এতে ওরা মাতৃ-সোহাগের অভাব ভুলতে পারে।"

তাত্তিলো প্লেমেনের জন্য যে সব মেয়েদের নির্বাচিত করেন তারা বেশ স্লিম হয়। তাদের চেহারার মধ্যে নারীসুলভ নমনীয়তা এবং কমনীয়তার প্রকাশ খুঁজে পাওয়া যায়।

সায়োনিরা তাত্তিলো একসময় একটি জনসংযোগ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৫ সালে তিনি এবং তার স্বামী ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির নাম 'বিগ'। এর একবছর পর তারা 'মেন' পত্রিকা বের করেন। 'মেন' পত্রিকাটিতে রাজ্যের মত রাবিশ ছবি ছাপা হত-বেশীর ভাগ উলংগ নারীদেহের ছবি। এগুলো ওরা স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশগুলো থেকে

প্রকাশিকা অ্যাদেলিনা তাত্তিলো

প্লেমেনের সাম্প্রতিক প্রচ্ছদ

সংগ্রহ করতেন এজেন্টের মাধ্যমে। উঠতি সিনেমা অভিনেত্রীদের এজেন্টরাও ওদেরকে এই পত্রিকার জন্য চোখ ধাঁধানো ছবি সরবরাহ করত।

প্লেমেন পত্রিকা প্রকাশের পূর্বেই অ্যাদেলিনা তাত্তিলোর সঙ্গে তার স্বামীর সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে।

তাত্তিলো প্লেমেন পত্রিকাটি বের করেন ১৯৬৭ সালে। পত্রিকাটি তখন ইতালীতে নিষিদ্ধ ছিল। বলাই বাহুল্য, এই নিষেধাজ্ঞার দরুণই পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা এবং ক্রেতা হুহু করে বেড়ে যায়।

প্লেবয় পত্রিকার সঙ্গে প্লেমেনের একটি বিরাট তফাৎ আছে। প্লেবয় পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় সম্পাদক হেফনারের যৌন সংক্রান্ত ব্যাপারে নিজস্ব কিছু চিন্তা থাকে। প্লেমেনে এ রকম কোনো দার্শনিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

প্রকাশের পর থেকেই পত্রিকাটি ইতালীর প্রায় প্রতিটি শহরেই পুলিশের রোষানলে পড়েছে। প্রতি মাসেই পুলিশ এবং ক্রেতার মধ্যে এই পত্রিকাটি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে—ক্রেতারা পুলিশ বাজেয়াপ্ত করার আগেই এটি সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হন আর পুলিশ চায় ক্রেতাদের হাতে এটা পৌঁছবার আগেই আটক করতে। বেশীর ভাগ সময় অবশ্য ক্রেতারাই এই খেলায় জয়ী হন। এই পত্রিকাটি আজ পর্যন্ত ইতালীর কোনো পত্রিকাবিপনীতে আটচল্লিশ ঘন্টার বেশী শোভা পেতে দেখা যায়নি। কেননা, এটি তার আগেই সাধারণত পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে ফেলতে সমর্থ হয়। তাত্তিলো বলেন, প্রতি সংখ্যা প্লেমেন প্রকাশ করতে ব্যয় হয় প্রায় ৬৪০,০০০ ডলার। অর্থাৎ, প্রায় ৩২০০,০০০ টাকা। এই পত্রিকার বর্তমান মূলধন প্রায় এককোটি টাকা।

প্রকাশিকা তাত্তিলোই প্লেমেনের সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। প্রচ্ছদের মুখ নির্বাচন থেকে শুরু করে ব্রিজিত বার্দোতের 'টপলেস' ছবি ছাপা সংক্রান্ত প্রতিটি ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।

হেফনারের মত তাত্তিলো পাঠকদেরকে যৌন সংক্রান্ত ব্যাপারে উপদেশ দেন না। তিনি বলেন, "ইতালীর পত্রিকাজগতের একটি অভাব পূরণের জন্যই প্লেমেন, যৌনতা ও প্রেম সম্পর্কীত ব্যাপারে মান্ধাতা আমলের কতিপয় বস্তাপচা নিয়ম-নীতির পরিবর্তনে সহায়ক হবে।"

প্লেমেন সম্ভবত: ইতালী সরকারের মনোভাব পরিবর্তনে সহায়ক হচ্ছে। পাঁচ বছর আগে ইতালীতে নগ্ন-বক্ষ কোনো রমনীর ছবি ছাপা রীতিমত অপরাধমূলক কাজ বলে বিবেচনা করা হতো। বাজেয়াপ্তকরণ অব্যাহত থাকলেও আজ পর্যন্ত প্লেমেনকে ইতালীর ৭২৫ ধারায় অভিযুক্ত হতে দেখা যায় নি। এই ধারায় সাধারণ শুচিতা ও সাধারণ রুচি লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। প্লেমেন কি মহিলাদের আত্মপ্রকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে তাত্তিলো বলেন, মি: হেফনারের বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ করার একটা কারণ আছে। তার পত্রিকায় যে সব মেয়েদের ছবি ছাপান হয় তাদেরকে বিশেষ একটি সামগ্রীর মত ব্যবহার করা হয়—তাদের ব্যক্তিসত্তার কোনো মূল্য দেয়া হয় না। আমি এর অনুসারী নই। আমরা আমাদের পত্রিকায় ছেলে এবং মেয়েদেরকে সমান সুযোগ এবং সম্মান দিয়ে থাকি। আমার মনে হয় মার্কিন ললনাদেরকে প্রথমত নিজেদের খাঁচা থেকে নিজেদেরকে বের হয় আসতে হবে। তাদের খপ্পরে পড়ে মার্কিন পুরুষদের যে সর্বনাশ ঘটছে সে সম্পর্কে তাদের অবহিত হওয়া উচিত। আমার তো আশ্চর্য লাগে যে, মার্কিন পুরুষেরা কেন তাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করছেন না।

সোফিয়া লোরেন

সপ্তদশী ছাত্রী

প্রথম পদক্ষেপ : মডেল

সোয়েটার গার্ল

জিনা লোলো ব্রিজিডা যখন খ্যাতির মধ্যগগণে তখন ইতালী থেকে হলিউডে এলেন আরো এক-জন অভিনেত্রী। তার নাম সোফিয়া লোরেন। তখন বিভিন্ন সাক্ষাতকারে দুজনই দুজনের বিরুদ্ধে কটু বাক্য উচ্চারণ করতেন। ঠিক তখন জনৈক বিদেশী সাংবাদিক এই দুই যৌনা-বেদনময়ী অভিনেত্রীকে একই ধরণের কতিপয় প্রশ্ন করেছিলেন। নীচে প্রশ্ন এবং জিনা ও সোফিয়ার উত্তর লিপিবদ্ধ করা হলো।

প্রশ্ন : আপনার শরীরের মাপ?

জিনা : ৩৬—২২—৩৫

সোফিয়া : ৩৮—২৪—৩৮

প্রশ্ন : আপনার এই চমৎকার দৈহিক গঠনের পেছনে কিসের অবদান রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

জিনা : বংশধারা ও প্রজাতি। আমার চারটি বোন আছে। তারাও আমার মতই দেহবল্লরীর অধিকারিনী।

সোফিয়া : স্প্যাগেটি—প্রতেকিদিন আমি এই খাদ্যবস্তুটি প্রচুর পরিমাণে গলা:-ধকরণ করে থাকি।

প্রশ্ন : অভিনেত্রী হিসাবে আপনরি সাফল্যের পেছনে আপনার দৈহিক গঠনের অবদান কতটুকু?

জিনা : মন্দ নয়! এটা সাহায্যই করেছে বলতে হবে।

সোফিয়া : অবদান? প্রচুর! আমার দৈহিক গঠনই তো আমাকে এত বিখ্যাত করেছে। এ জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

প্রশ্ন : ইতালীয় চলচ্চিত্র উৎসবের সময় আপনাদের দুজনের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল—তাই না?

জিনা : আমার তো কোনো বিরো-ধের কথা মনে পড়ছে না। এই দুনিয়ায় কেউ কারও প্রতিবন্ধক হতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

জিনা আমাকে দেখতে পারে না, তার কারণ আমার শরীরের বাড়তি দু'ইঞ্চি।

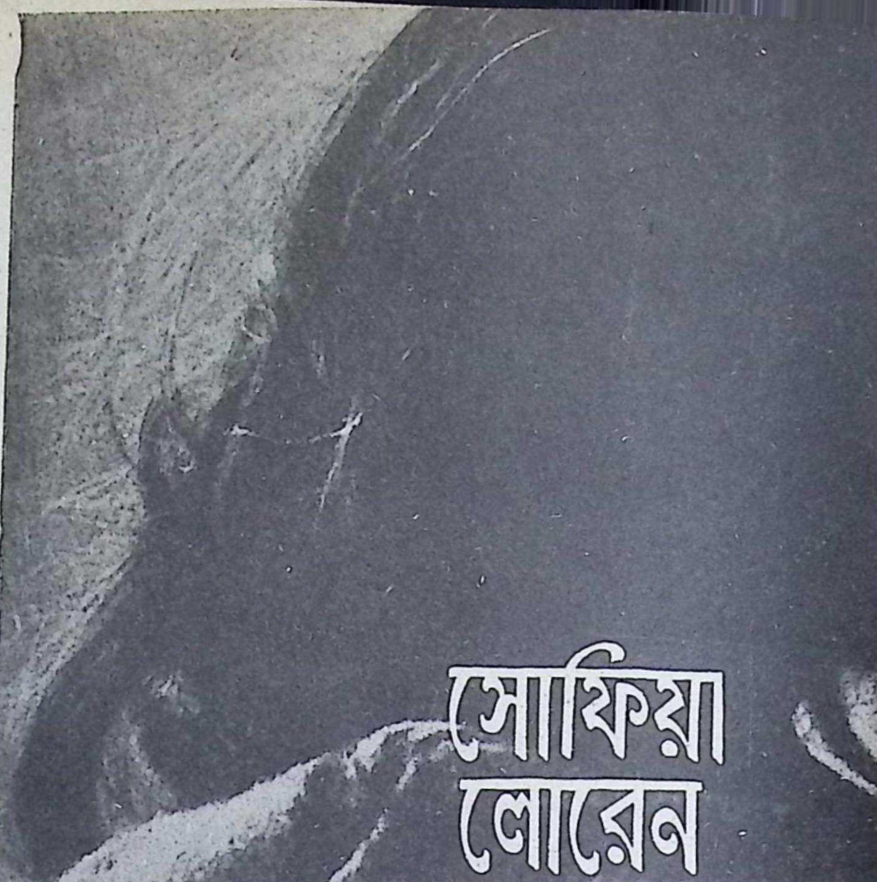

বনাম

জিনা লোলো

সোফিয়া: আমার বয়স তখন মাত্র কুড়ি। জিনা তখন আমাকে অপমান করেছিল। ওর বয়স তখন সাতাশ—ও তখন বিশ্বখ্যাতি পেয়েছে। ও কি আর ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারত না? কিন্তু জিনা তা করেনি।

প্রশ্ন: তাহলে আপনাদের কারও সঙ্গে কোনো বিরোধ কিংবা রেষারেষী নেই বলতে চান?

জিনা: আমার ধারনা সোফিয়া অত্যন্ত চমৎকার একটি মেয়ে। ওকে আমি আমার প্রতিদ্বন্দী মনে করি না। আমি যে সব চরিত্রে অভিনয় করি সে সব চরিত্রে ও অভিনয় করতে পারবে না।

সোফিয়া: জিনার ব্যক্তিত্ব তেমন মুগ্ধ হওয়ার মত কিছু নয়। চাষার বউ-য়ের ভূমিকায় ও ভালই অভিনয় করতে পারবে—কিন্তু সত্যিকার সম্ভ্রান্ত মহিলার চরিত্রে ওকে মোটেই মানাবে না। আমার মনে হয় জিনা আমাকে দেখতে পারে না তার কারণ আমার শরীরের বাড়তি দু ইঞ্চি।

প্রশ্ন: হয়েছে, হয়েছে, আর না। এবার বলুনদিকি, মার্কিন পুরুষদের আপনার কেন ভালো লাগে?

জিনা: অযথা শ্রেণীভাগ করে লাভ কি? পুরুষ পুরুষ। ওদের ওপর নির্ভর করেই তো বেঁচে আছি।

সোফিয়া: মার্কিণ পুরুষ। আমার খুব প্রিয়। আজও যে আমি বেঁচে আছি সেও এক মার্কিণ পুরুষের কল্যাণে। যুদ্ধের সময় এক মার্কিণ জি আই(সৈনিক) ভদ্রলোক আমাদের বাঁচিয়েছিলেন আমার বয়স তখন নবছর। তার দয়া না পেলে বাঁচতাম না। ভদ্রলোক সেনাবাহিনীর সার্জেণ্ট ছিলেন। তিনি আমাদেরকে খেতে দিতেন। আমি যদি কোনোদিন ওই ভদ্রলোকের দেখা পাই তাহলে তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ঋণমুক্ত হওয়ার প্রয়াস পাব।

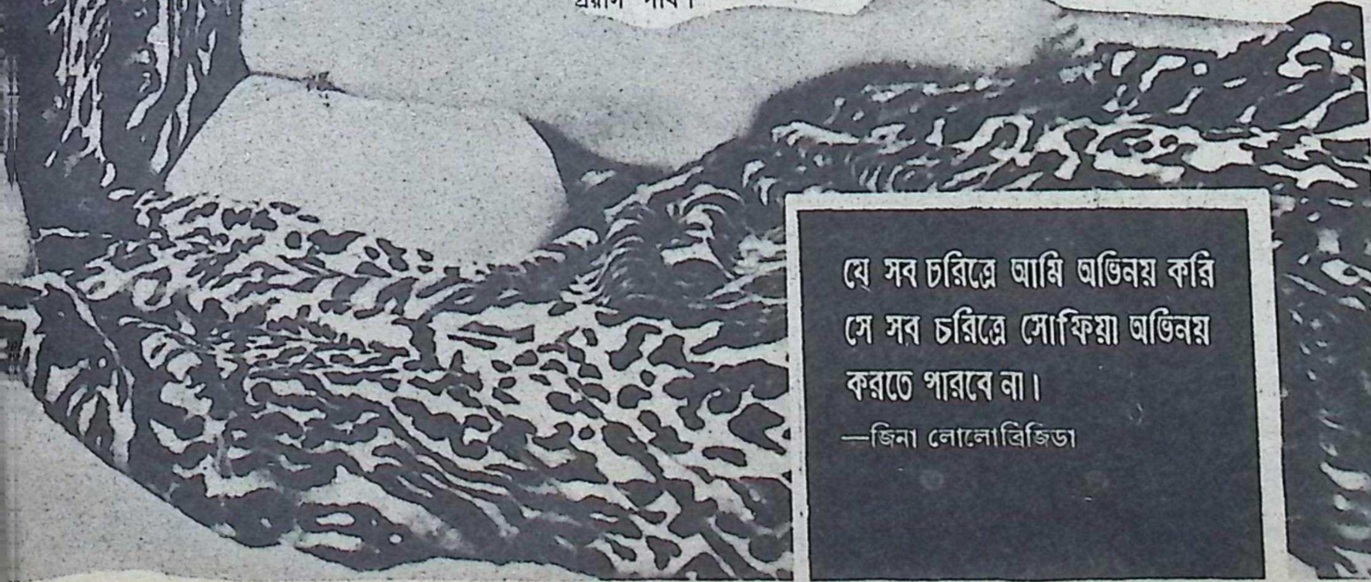

যে সব চরিত্রে আমি অভিনয় করি সে সব চরিত্রে সোফিয়া অভিনয় করতে পারবে না।
—জিনা লোলোব্রিজিডা

প্রশ্ন: ভদ্রলোক চেনার উপায় কি? আপনি ভদ্রলোকদের কিভাবে সনাক্ত করেন?

জিনা: এ ব্যাপারে আমি আমার অনুভূতির উপর নির্ভর করে থাকি।

সোফিয়া: আমি যখন আসন গ্রহণ করি লোকটি তখন কি ভাবে আমার দিকে তাকায় তার উপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন: পছন্দসই পুরুষকে নিজের অধিকারে রাখবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি?

জিনা: বিয়ে।

সোফিয়া: দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকের মাঝখানে টেনে নেওয়া।

প্রশ্ন: পুরুষ নামক জন্তুর সঙ্গে মেলামেশার সময় মেয়েরা সাধারণত কোন ভুলটি করে বসে?

জিনা: পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চাওয়া।

সোফিয়া: কোনো ভুল না করার ভুল।

প্রশ্ন: পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী কে?

জিনা: তেমন মেয়ে নেই।

সোফিয়া: ফিঙ্কস।

প্রশ্ন: গ্ল্যামার বলতে আপনি কি বোঝেন?

জিনা: আমি জানি না।

সোফিয়া: ছবিতে নামবার আগে আপনি যে বস্তুটির প্রয়োজনীয়তা সবচে বেশী আছে বলে মনে করেন।

প্রশ্ন: একটি মেয়ের জীবনে সবচেয়ে শোকাবহ ঘটনা কি হতে পারে?

জিনা: অবিবাহিত থাকা।

সোফিয়া: খারাপ চেহারা নিয়ে জন্মানো। ইতালীতে এমন মেয়ের চাকরী করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

প্রশ্ন: কোন বয়সে আপনি বালিকা থেকে নারী হয়ে উঠলেন?

জিনা: উদ্বেগ বলতে কি বোঝায় তা জানার পর থেকে।

সোফিয়া: আমাকে সবাই কঞ্চি বলে ডাকত—এত রোগাপাতলা ছিলাম আমি। কিন্তু চোদ্দোর কোঠায় পা দিতেই আমার শরীর ভরাট হয়ে উঠতে লাগল। লোকেরা আমার দিকে চোখ ফেরাতে আরম্ভ করল। আমি সাবালিকা হয়ে উঠলাম।

জিনা লোলো

যখন ষোড়শী

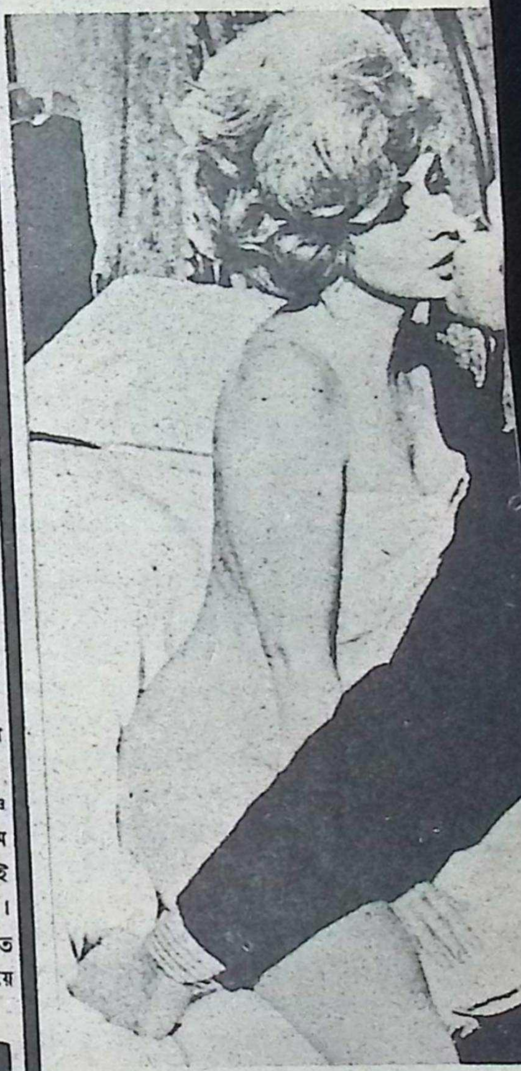

তারপর...

চল্লিশোর্ধ কিশোরী

প্রশ্ন : আপনার কখন নিজেকে সবচেয়ে বেশী সম্মানিতা মনে হয়েছে ?

জিনা : যেদিন আমার স্বামী আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন ।

সোফিয়া : যেদিন এক য়ুনিভার্সিটি অধ্যাপক আমার শরীরের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন: প্রত্নতত্ত্বের কি বিরাট ক্ষতিই না হয়ে গেল !

প্রশ্ন : আপনার জীবনে সবচেয়ে অপমানজনক ব্যাপার কি ঘটেছে ?

জিনা : সোফিয়া যেদিন লণ্ডনের "সানডে টেলিগ্রাফ"-এর সংবাদদাতাকে বলে যে সে আমাকে আদৌ শ্রদ্ধা করে না। এরপর সে বলে যে সে আমেরিকায় যাচ্ছে এবং এখন থেকে আমি ইতালীতে একাই রাজত্ব করতে পারব ।

সোফিয়া : জিনা লোলোব্রিজিডা আমাকে নেপল্‌সের জিরাফ বলেছিল সেদিন ।

প্রশ্ন : আপনি ডিনারে সিনেমা জগতের কাকে কাকে আমন্ত্রণ জানাবেন ?

জিনা : ভিটোরিয়া ডি সিকা, বার্ট ল্যাংকেস্টার, ডিন মার্টিন এবং বেটি ডেভিস ।

সোফিয়া : মার্লিন ডিয়েট্রিস, ভিট্টোরিও ডি সিকা, ইনগ্রিড বার্গম্যান আর এ্যানা ম্যাগনানী ।

প্রশ্ন : এ পর্যন্ত কোন চরিত্রে অভিনয় করে আপনি সবচে বেশী তৃপ্তি পেয়েছেন ?

জিনা : "হ্যানচব্যাক অব নত্রদাম" ছবিতে জিপসী মেয়ে এসমেরাওার চরিত্রে অভিনয় করে ।

সোফিয়া : আমার প্রথম আমেরিকান ছবি "প্রাইড এণ্ড প্যাশন"-এ অভিনয় করে। এই ছবিতে আমি একটি গেরিলা মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করি। আমার সহ-অভিনেতা ছিলেন ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা এবং ক্যারি গ্রাণ্ট। পরিচালক ছিলেন ষ্ট্যানলি ক্রেমার। এই ছবিতে আমি স্পেনের বহুখ্যাত ফ্লোমিঙ্গো নাচ নেচে ছিলাম। এই ছবির মৃত্যু দৃশ্যে অভিনয় করেও আমি যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছিলাম। অবশ্য, সব কৃতিত্বই পরিচালক ক্রেমারের প্রাপ্য ।

প্রশ্ন : ছবিতে নামবার প্রথম সুযোগ আপনি কেমন করে পেলেন ?

জিনা : ১৯৪৭ সালে, আমি তখনও কলাবিভাগের ছাত্রী, মিস ইতালী প্রতিযোগিতায় যোগ দিই। আমি বিজয়িনী হতে পারিনি। কিন্তু এতে যোগ দেওয়ার পর আমি ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে যাই ।

সোফিয়া : আমার মা আমাকে মিলানের সমুদ্র-রাজকুমারী প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। আমি বিজয়িনী হতে পারিনি, তবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমার চেয়ে কম সুন্দরী একটি মেয়ে এই প্রতিযোগিতার বিজয়িনী হয়। এর ফলে উপস্থিত দর্শকেরা দারুণ ক্ষেপে যায়। তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত, পুলিশ এসে শান্তি রক্ষা করে। এরপর, রোমে, আমি স্বীকারোক্তিমূলক রচনার 'মডেল' হতে থাকি। আমার বয়স তখন ষোলো। তাহলে কি হবে, পত্রিকা সম্পাদক এবং ছবির প্রযোজকেরা আমাকে দেখে আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। দুবছরে আমি ১৩টি ছবিতে অভিনয় করি। এরপর বিখ্যাত প্রযোজকেরা আমাকে ওদের ছবিতে অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ করতে থাকেন ।

প্রশ্ন : অভিনয় ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার নিজের ধারনা কি ?

জিনা : আমি প্রতিটি ছবি থেকেই কিছু না কিছু শিখবার চেষ্টা করি। আমি নিজেকে একজন সফল অভিনেত্রী বলেই বিবেচনা করি ।

সোফিয়া : আমি সত্যিকার অভিনেত্রী হতে চাই। এটা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগামী দশবছরের মধ্যে সকলেই আমাকে একজন সার্থক অভিনেত্রী বলে স্বীকার করে নেবেন বলে আমার ধারণা। আমি বিরাট অভিনেত্রী হিসাবেই স্মরণীয় হয়ে থাকব ।

প্রশ্ন : খ্যাতি-প্রতিপত্তি তো অনেক পেয়েছেন—এখন আপনার কিসের অভাব ?

জিনা : স্বামীর সঙ্গে সন্ধ্যাটা নিরিবিলিতে কাটাতে পারলে সুখী হতাম ।

সোফিয়া : শনিবারের রাতে যুবক সঙ্গীর সঙ্গে যদি সিনেমা দেখতে যাবার সুযোগ এবং ফেরার পথে পিয়াজ্জরতে দাঁড়িয়ে গরম গরম পিজ্জা খাওয়া সুযোগ পেতাম ।

প্রশ্ন : বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হিসাবে

এলিয়ট গাউল্ড দশ বছর আগেই তারকার আসনে বসেছিলেন। তখন একটি নতুন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, নাম বারবারা। পরিচয়ের পরিণতি ঘটলো বিয়েতে। এরই পরপর সুকণ্ঠি মেয়েটি মঞ্চে অভিনয়ের একটি সুযোগ পেয়ে গেল—সঙ্গীত মুখর নাটকটির নাম 'ফ্যানি গার্ল'। রাতারাতি জনপ্রিয়তার শিখরে উঠে গেল মেয়েটি। এলিয়ট সে খ্যাতির কাছে ম্লান হয়ে গিয়ে অভিনয় ছেড়ে দিয়ে 'মিষ্টার বারবারা স্ট্রেইস্যাণ্ড' হয়ে রইলেন। ছবিতে নামলেন বারবারা—প্রথম ছবিতেই পেলেন অস্কার। পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোর বাইরে অন্ধকারে রয়ে গেলেন এলিয়ট। ।

একই ঘটনা ঘটলে একটি মেয়ের বেলায়। তার নাম ডিয়ান ক্যানন। ছবির রাজ্যে ছোটখাটো সুযোগ পাচ্ছিলেন—এমন সময় পরিচয় হল চিরসবুজ নট ক্যারি গ্রাণ্টের সঙ্গে। বিয়ে করলেন ওরা পঁয়ষট্টি সালে। উঠতি মেয়েটির নাম আর কেউ মনে রাখলো না—যদিও মিসেস ক্যারি গ্রাণ্ট হিসাবে তার যথেষ্ট সম্মান ছিল। ক্যারির ৬৫ বছর বয়সের একমাত্র সন্তানের মা-ও-হলেন—সমগ্র সত্তাই তার গ্রাস করলো ক্যারি গ্রাণ্টের খ্যাতি। নতুন করে ভাবতে শুরু করবে, ডিয়ান, ভাবলেন, আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা।

এলিয়ট ও বারবারা

মনোবিজ্ঞানীর ঘরে ঘন্টার পর ঘন্টা পরামর্শ নিতে দেখা গেল ডিয়ানকে। এক দিন সিদ্ধান্ত নিলেন, খুঁজে পেলেন নিজেকে—ক্যারির বন্ধন কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, মুক্ত পৃথিবীতে ছেড়ে দিলেন নিজেকে। ক্যারি ঘর দিতে পারে, সন্তান দিতে পারে, সম্মান দিতে পারে কিন্তু সব কিছু দেয় সত্তার বিনিময়ে। এদিকে এলিয়ট কর্মহীনভাবে ঘরে বসে থাকতে থাকতে সিদ্ধান্ত নিলেন ডিভোর্সের নয়, সেপারেশনের। কারণ এলিয়ট বলেছেন : 'এক সময় ছিল দুজনই ছিলাম গরীব, আমি বারবারাকে ঘর দিতে পারতাম, এখন তার প্রয়োজন নেই বারবারার। তার অনেক রয়েছে।'

'বব এণ্ড ক্যারল এণ্ড টেড এণ্ড এলিস ছবিতে এলিয়ট (সর্ববামে) ডিয়ান (ডানে)

ছবিতে নামলেন এদিকে এলিয়ট এবং ওদিকে ক্যারির ডিয়ান নতুন করে। আশ্চর্য যে একই ছবিতে। দুইজনের ভূমিকা স্বামী-স্ত্রীর। ছবির নাম 'বব ক্যারল, টেডএলিস'। দুটি দাম্পত্য জীবনের কাহিনী। আধুনিক দাম্পতি, তারা সুখী—অথচ কোথায় যেন অভাব থেকে যাচ্ছে। আরো সুখ চাই, আরো আনন্দ। ওরা একদিন ঠিক করলো দুই দম্পতি এক সঙ্গে শয্যা গ্রহণ করবে—পরস্পরের স্ত্রীকে বদল করবে। এলিস ও টেড হচ্ছে

কোন পরিস্থিতিতে আপনি সবচেয়ে বেশী অপ্রস্তুত বোধ করেন ?

জিনা : ধরুন, কারও সঙ্গে কথা বলছি অথচ তার নাম ধাম পদবী কিছুই স্মরণ করতে পারছি না—এই রকম পরিস্থিতিতে আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করি।

সোফিয়া : আমি ঠিক জানি না। আমি এখন চলে যেতে চাই—এই কথাটি কাউকে বলবার সময় হলে—সম্ভবত।

প্রশ্ন : ধরুন, আপনি জানতে পারলেন, এই পৃথিবীতে আর মাত্র আধঘণ্টা বাঁচতে পারবেন। তখন আপনি কি করবেন ?

জিনা : আমি সময়টুকু কোনো একজনকে তার স্যুটিং বন্ধ রাখার জন্য উপদেশ দিয়ে ব্যয় করব।

সোফিয়া : আমি একটি ছুরি সোজা নিজের হৃদ্‌পিণ্ডে ঢুকিয়ে দেব।

প্রশ্নকর্তা : আমাদের সাক্ষাৎকারের এখানেই ইতি। আচ্ছা বলুন তো, ইতিপূর্বে এই ধরণের প্রশ্ন আপনাদেরকে আর কেউ করেছেন ?

জিনা : মোটেই না। আরও কিছু থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

সোফিয়া : উহু, আমার তো মনে পড়ে না। কিন্তু আমি একটা কথা জানতে চাই। আচ্ছা, জিনাকে কি আপনি একই ধরণের প্রশ্ন করেছেন ? আপনাদের—মানে সাংবাদিকদের কথা বলছি, মাথায় এত দুষ্টুবুদ্ধিও খেলা করে।

ডিয়ান

ডিয়ান ও এলিয়ট।

মোড় ঘুরে গেল। ৬৯ সালের সবচে আলোচিত নায়ক এলিয়ট—এখন একের পর এক ছবিতে অভিনয় করছেন, সুইডেনের বেয়ারীম্যানের ছবিতেও অভিনয় করবেন। তিনি হবেন বেয়ারীম্যানের প্রথম বিদেশী নায়ক।

গেটিং ষ্ট্রেইট ছবিতে এলিয়ট

আর এদিকে ডিয়ানের সাম্প্রতিকতম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটির নাম 'ডকটর্স ওয়াইভস'। এ ছবির শেষ দৃশ্যে ডিয়ানকে তার স্বামী হত্যা করবে প্রেমিকের সঙ্গে এক বিছানায় এক বুলেটে।

ইতালিয়ান স্ক্যাণ্ডাল ঃ ষ্টাইল

তিনটি লাশ পড়েছিল এক ইতালিয় বাগানবাড়ীতে। স্বামী, স্ত্রী এবং স্ত্রীর প্রেমিক।

সুখ্যাত ইতালীয় ঔপন্যাসিক আলবার্তো মোরাভিয়ার উপন্যাসে এই ধরণের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। মৃত স্বামী ইতালীয় রাজপুরুষ কোটিপাতি মার্কুইস ক্যামিলো ক্যাসাটি ষ্টামা ডি সোনিকো। বয়স ৪৫, তার পদবীটির মতই খ্যাতিমান ছিলেন। সুন্দরী, ৪১ বছর বয়স্কা, তার স্ত্রীর নাম অ্যানা।

স্ত্রীর প্রেমিক ম্যাসিমো। ছাত্র। বয়স মাত্র ২৫।

পুলিশ যথারীতি তদন্ত শুরু করে। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী মার্কুইস শিকারে গিয়েছিলেন, শিকার থেকে ফিরে প্রিয়তমা স্ত্রীকে এই যুবকের আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখে দিশা হারিয়ে ফেলেন এবং ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে প্রেমিক যুগলকে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেন।

ক্যাসেটি অর্থাৎ মার্কুইসের লেখা একটি চিরকুটও পুলিশের হস্তগত হয়েছে। এই চিরকটে লেখা ছিল, "অ্যানা, অন্যের প্রতি তোমার ভালবাসা আমি সহ্য করতে অপারগ।"

ক্যাসাটি : বিদেহী ভালবাসা

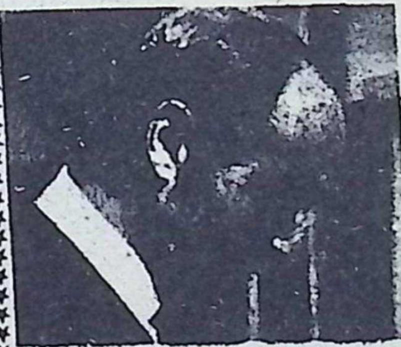

ব্যাপারটা এইখানে চুকে গেলে কারও কিছু বলার থাকত না! কিন্তু পুলিশের রিপোর্ট প্রকাশের অব্যবহিত পরে গত সেপ্টেম্বর মাসে কিছু কিছু তথ্য ও ছবি সাংবাদিকদের হস্তগত হতে থাকে। এর ফলে পুরো ব্যাপারটা একটা জঘন্য স্ক্যাণ্ডালে পরিণত হয়। ছবিগুলির বেশীরভাগই মার্কুইসের স্ত্রীর অর্থাৎ, অ্যানার। বিকিনি পরিহিতা অ্যানা, টপলেস অ্যানা, শুধু একটি রঙীন টুপী পরিহিতা অ্যানা, নগ্নিকা অ্যানা এ সব তো ছিলই।

এছাড়াও কতকগুলো ছবিতে, অ্যানাকে অশ্লীল পর্নোগ্রাফিক পোজে দেখা গেল। ফটোগ্রাফার মার্কুইস। এই ছবিগুলো নিয়ে হৈ চৈ যখন পুরোমাত্রায় শুরু হয়ে গেছে, তখন সাংবাদিকদের আরও একটি বস্তু হস্তগত হল। সেটি হচ্ছে। নীল কাপড়ে বাঁধাই করা ক্যাসেটির একটি ব্যক্তিগত দিনলিপি—অর্থাৎ, দিনানুদৈনিক, কর্ম এবং আচরণের তালিকা।

দিনলিপিটির অংশবিশেষ পাঠ করে জানা গেল, ৪৫ বৎসর বয়স্ক মার্কুইসের কতগুলো বিকৃত বাতিকের কথা। মার্কুইস সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছাত্র, বীচ বয়, সৈনিক ইত্যাদির সঙ্গে স্ত্রীর অবাধ প্রণয়চর্চার সুযোগ সুবিধা করে দিয়ে একধরনের আমোদ উপভোগ করতেন। শুধু যোগাযোগ

অ্যানা : অপ্রেম দেহ

ঘটিয়ে দিয়েই মার্কুইস নিরস্ত হতেন না, তিমি স্ত্রীর সঙ্গে অন্যের প্রণয়চর্চার ছবিও তুলতেন। দিনলিপিতে মার্কুইসের আয়-ব্যয়ের একটি তালিকা পাওয়া গেছে। এতে তিনি স্ত্রীর কোন প্রেমিককে কত মজুরী দিয়েছেন তারও উল্লেখ আছে। এই ডাইরীর নগ্নতায় একজন সাংবাদিক বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করেন, 'বীভৎস ধরনের নোংরা।' দিনলিপিটি প্রকাশিত হওয়ার পর একটি প্রশ্ন উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। প্রশ্নটি হচ্ছে, মার্কুইসের ইচ্ছাতেই স্ত্রী এত কিছু করতেন। তবে মার্কুইস অসূয়ার বশবর্তী হয়ে তার স্ত্রীর প্রেমিক এবং স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করতে গেলেন কেন ?

পুলিশ এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে একটি তথ্যের সন্ধান পেয়েছে। সেটি হচ্ছে : ক্যাসেটি ইতালী সরকারকে আইনতঃ প্রাপ্য কর ফাঁকি দিতেন, দুর্নীতিপরায়ণ কর নির্ধারককে ঘুষ দিয়ে বছরের পর বছর। এবং এটা তেমন আশ্চর্য কোন তথ্যই নয়—ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া ইটালীয় বড়লোকদের জাতীয় চরিত্র।

পুলিশের আইন এই হত্যার 'মোটিভ' খুঁজে পায় নি। কিন্তু মার্কুইস নিজেই লিখে রেখে গেছে : আই ক্যান নট বেয়ার ইওর লাভ ফর এ্যানাদার।

অ্যানা হয় তো ম্যাসিমোকে দেহের সঙ্গে হৃদয়টাও দান করে বসেছিল। যা প্রেমিক মার্কুইস মানতে রাজী হন নি।

নবাগতা নায়িকা

মিনু রহমান

ঢাকার মঞ্চে অনেক অভিনয় করেছেন, হঠাৎ এসে পড়েছেন চলচ্চিত্রে। বয়স কিশোর পেরিয়েছে। জীবনে নানা উঠতি পড়তি ঘটেছে অথচ মহিলা প্রচুর হাসতে পারেন। মিনু রহমানকে দেখে প্রথম দর্শনে যা মনে হয় তা হচ্ছে লাবণ্য আছে, শ্রী আছে। তার সম্পর্কে অনেকে অনেক রকম আশা করছেন—কিন্তু সব নির্ভর করছে তার প্রথম ছবি ই, আর, খান পরিচালিত 'দাসী'র সাফল্যে। ছবির পরিচালক মিনু রহমান সম্পর্কে আশাবাদী। দাসীর কিছু 'রাশ' দেখে আশাবাদী হতে আমাদেরও আপত্তি নেই।

মিনু এ বছরের উল্লেখযোগ্য নতুন সংযোজন হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

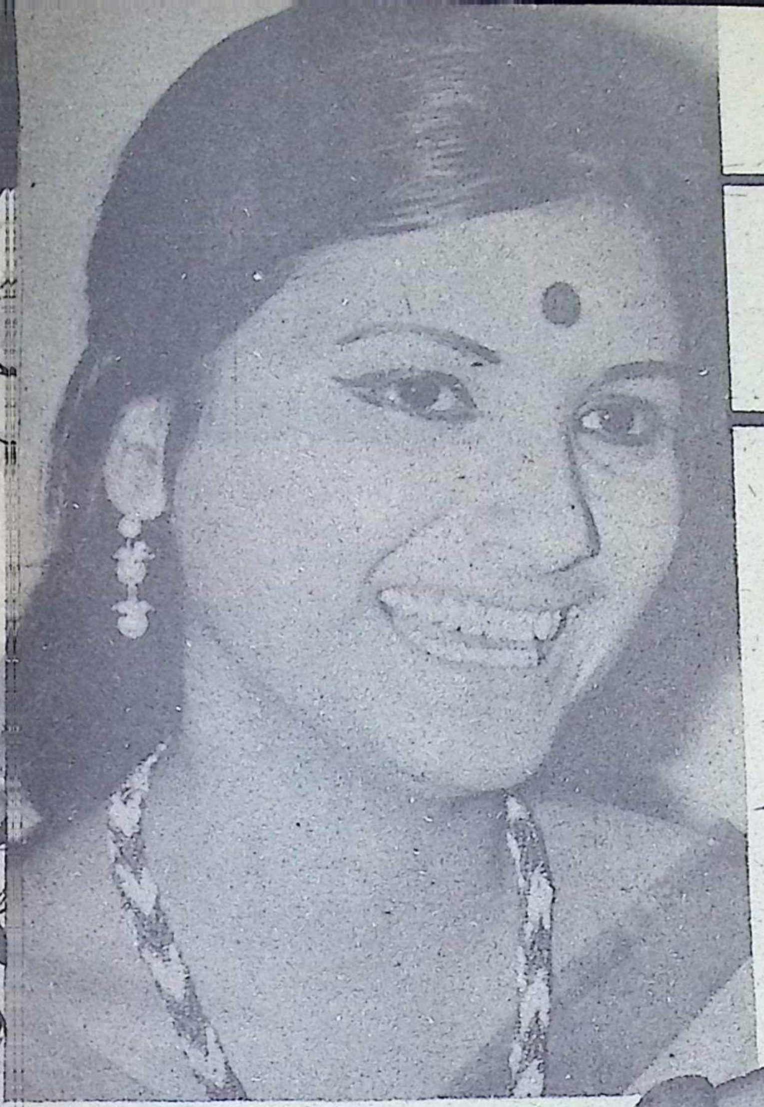

মিনু রহমান

চট্টগ্রাম
বিশ্ববিদ্যালয়
জাদুঘর
সং নং

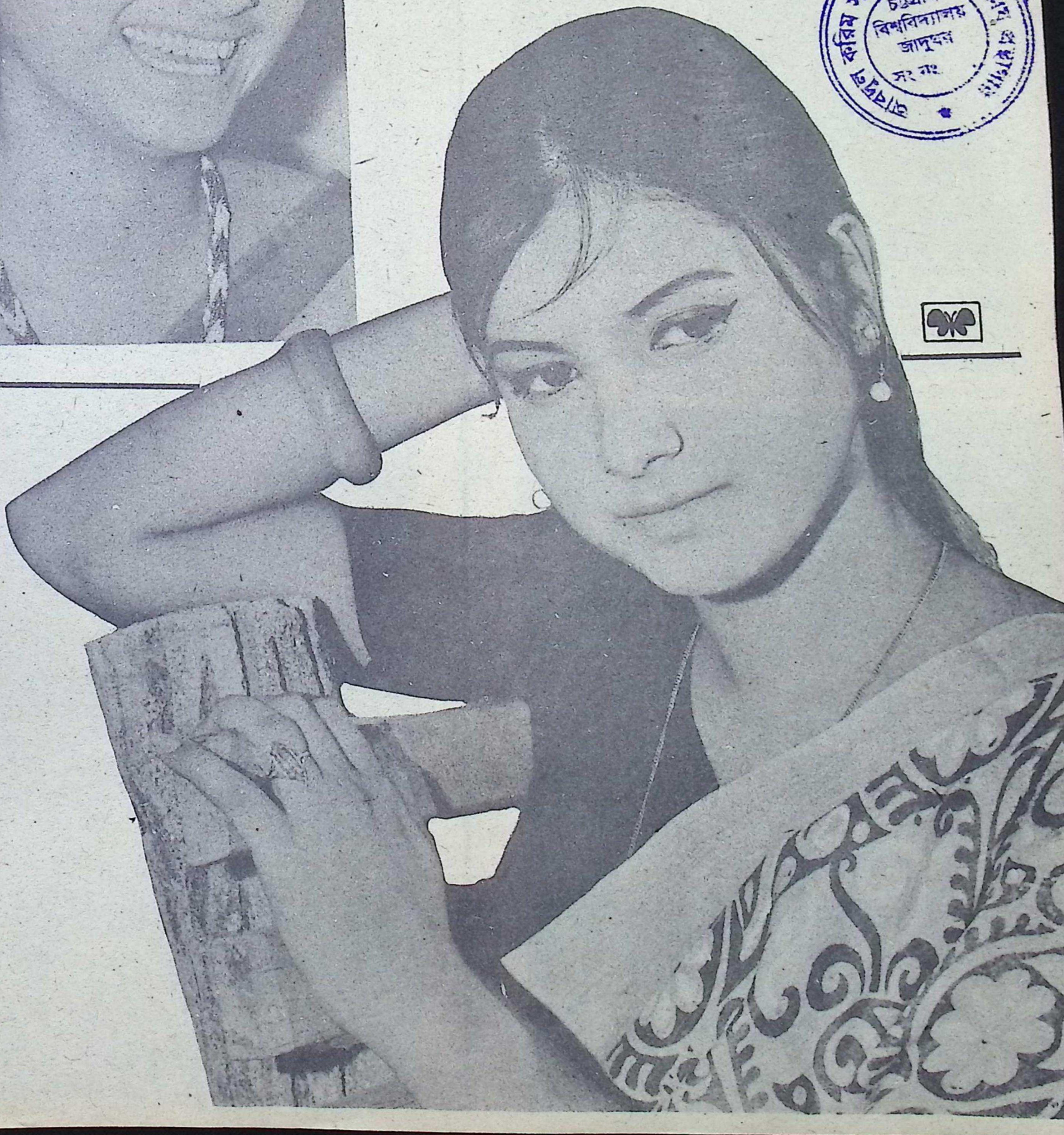

ভারতীয় ছবি

অবশেষে শর্মিলা ঠাকুর ও দিলীপকুমার একসঙ্গে অভিনয় করছেন। তাদের প্রথম ছবিটির নাম দাস্তান।

তপন সিংহ পরিচালিত এবং দিলীপকুমার ও সায়রা বানু অভিনীত অর্থ সফল বাংলা ছবি সাগিনা মাহাতোর রঙ্গিন হিন্দি চিত্ররূপের নায়ক-নায়িকা সায়রা বানু ও দিলীপকুমার।

বোম্বের নবাগত নায়িকা অঞ্জনা।

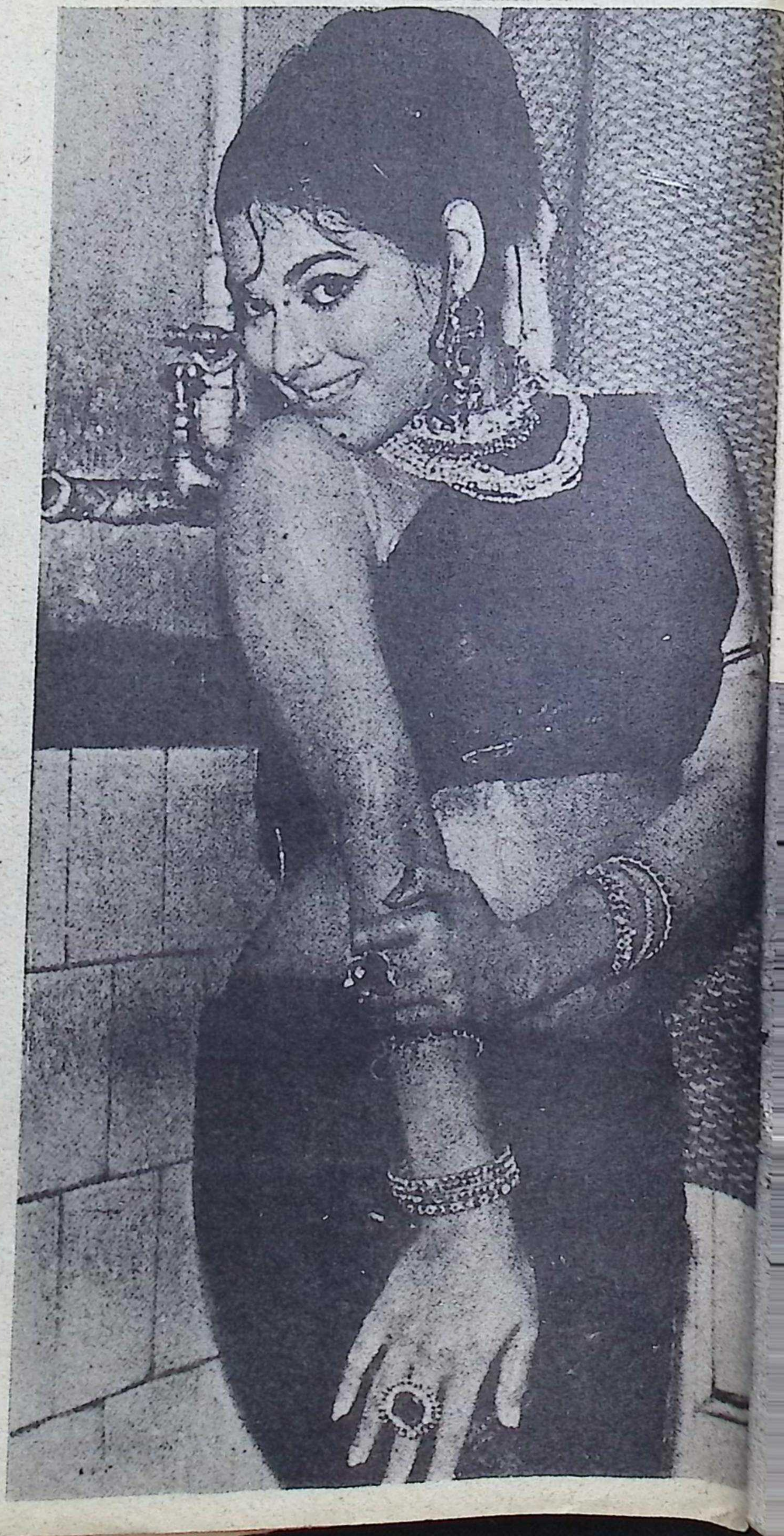

উনিশ শ সত্তরসালে পশ্চিম বাংলায় মোট ছাব্বিশটি বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছে। এছাড়া দুটি দক্ষিণ ভারতীয় ছবি বাংলা ভাষায় ডাব করে দেখান হয়েছে। মুক্তি প্রাপ্ত ছবিগুলির অধিকাংশই সামাজিক-সমস্যামূলক কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে। দুটি ছবি তৈরী হয়েছে বিখ্যাত জীবনকাহিনী অবলম্বনে। একটি ছবি নির্মিত হয়েছে পৌরনিক কাহিনী অবলম্বনে।

সত্যজিৎ রায়ের প্রতিদ্বন্দী বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য ও সত্যজিৎ রায়েরই (অরণ্যের দিন রাত্রি)। বছরের শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মানও সত্যজিৎ রায়েরই প্রাপ্য (প্রতিদ্বন্দী)। গত বছর বাংলা ছবিতে শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন বোম্বের দিলীপকুমার (সাজিনা মাহাতে)।

গত বছর প্রায় আধা-ডজন নতুন পরিচালক ছবি তৈরী করেছেন। এ ছাড়া বেশ কিছু নতুন মুখের সন্ধানও পাওয়া গেছে। এরা হচ্ছে, ভাস্কর চৌধুরী, দেবরাজ রায়, ধৃতিমান চ্যাটার্জি, রণজিত মল্লিক, বুলবুল মুখার্জী, দীপা চ্যাটার্জি, জয়শ্রী রায়, কৃষ্ণা বসু এবং মমতা চ্যাটার্জি।

গত বছরে ভারতে রেকর্ড সংখ্যক ছবি নির্মিত হয়েছে। ছবির সর্বমোট সংখ্যা ৩৯৬। ১৯৬৯ সালে ছিল ৩৮৩।

ছবির ব্যবসাও অন্যান্য বছরের তুলনায় ভালই করেছে। দুটি ছবি সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করেছে। আটটি ছবি রজত জয়ন্তী পালন করেছে। এছাড়া বেশ কতকগুলো ছবি একশ দিন ধরে এক-নাগাড়ে প্রদর্শিত হয়েছে।

'সাউণ্ড অব মিউজিক' [illegible]নে কোলকাতায় নির্মীয়মান বাংলা ছবি জয়জয়ন্তীতে জয়া ভাদুড়ী

দুটি বাংলা ছবি রজত জয়ন্তী পালন করেছে। একটি পাঞ্জাবী ছবিও এই সম্মানের অধিকারী হতে পেরেছে।

কাভি বহর্খী ছবিতে সঞ্জয় ও নবাগত লিনা চান্দাভারকর

লিনা ও ধর্মেন্দ্র ছবির দৃশ্যে নয়— বোম্বের ষ্টার এণ্ড ষ্টাইল পত্রিকার ফটোগ্রাফারের লেন্সে

জ্যাকি ও রক হাডসন

জ্যাকি ওনাসিসের চিত্রাবতরণ নিয়ে নানা খবর পরিবেশন করছে ইয়োরোপীয় পত্র-পত্রিকা। ওনাসিস প্রযোজিত এ ছবির পরিচালক থাকবে 'গ্রাজুয়েট' খ্যাত মার্কিন পরিচালক মাইক নিকোলাস। জ্যাকি অভিনয়ের জন্যে যে টাকা পাবেন তা রেড ক্রসে দান করবেন বলে জনৈক বন্ধুর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে। জ্যাকির বিপরীতে থাকবে রক হাডসন। তবে প্রেমের দৃশ্যে জ্যাকি অভিনয় করবেন না বলে আরেক গুজবে বলা হচ্ছে।

কিং ডেভিড ও পিপিং টম

ইসরাইলের বন্দর শহর হাইফায় এক পিপিং-টম গ্রেফতার করা হয় যখন সে একটি মেয়ের ঘরে উঁকি দিয়ে কাপড় ছাড়া দেখছিল। পিপিং-টম পুলিশকে বলে সে কিং ডেভিডের মত প্রেমে পড়তে চায়। কিং ডেভিড বাথশেবাকে দেখেছিল নগ্ন স্নান করতে। পুলিশ ছেলেটিকে ছেড়ে দেয়।

প্লে-বয়ের আকাশ-হারেম

প্লে-বয় পত্রিকার সার্কুলেশন এখন ষাট লক্ষের মত। এই পত্রিকার 88 বছর বয়স্ক মালিক-সম্পাদক হিউ হেফনার এই পত্রিকাটি যখন শুরু করেন তখন ছিলেন কপর্দক হীন, স্ত্রী কর্তৃক পরিত্যক্ত অথচ উচ্চাভিলাসী যুবক। বর্তমানে ১৮ বছর পর তিনি আমেরিকার বড়লোকদের একজন। পত্রিকা ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি হোটেল এবং ক্লাবও আছে—প্লেবয়ের সিম্বল র‍্যাবিট আঁকা হাজার রকমের বিক্রির জিনিস। বিয়ে করেননি, কিন্তু নিত্য নতুন বান্ধবী সংগ্রহ করেন। বর্তমানে তিনি প্রেমে পড়েছেন বলে জানাচ্ছেন। মেয়েটির নাম বারবি বেনটন। সম্প্রতি বারবিকে নিয়ে তিনি ইউরোপ পরিভ্রমণে এসেছিলেন নিজস্ব ডিসি—নাইন জেট লাইনারে। যাকে সাংবাদিকরা বলেছেন 'পোর্টেবল প্যারাডাইস'। ছয়জন বাছাই করা বানি (প্লেবয় ক্লাবের ওয়েট্রেস) সঙ্গে ছিল।

ছবিতে ড্রিঙ্ক সার্ভ করছে একজন বানি-

হাসি ঃ কবরী

শাহনাজের জীবনী চিত্র ?

প্রাক্তন সি এস পি মুস্তফা জায়েদী হত্যারহস্যের প্রধান নায়িকা শাহনাজ সেলিমের জীবনী নিয়ে ছবি তোলার পরিকল্পনা করেছে করাচীর জাদিদ প্রডাকশন। ছবিটির প্রযোজক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জায়েদীর জনৈক বন্ধু। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করছেন আহমেদ নাজিম কাজমী। এতে মৃত মুস্তফা জায়েদীর লেখা গানও চিত্রায়িত করা হবে। তা ছাড়া বিখ্যাত কবি কাতিল সিফাইও গান লিখছেন ছবিটির জন্যে। নায়িকা এখনো নির্বাচিত হয় নি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কিছুদিন আগে মুস্তফা জায়েদীকে তার ঘরে মৃত, পাশে শাহনাজকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায়, পাওয়া যায়। শাহনাজ বিবাহিত, সন্তানের মা। সংবাদপত্রে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক চোরাচালান ও গুপ্তচরচক্রের সঙ্গে শাহনাজের জড়িত থাকার সম্ভাবনা আছে। সম্প্রতি পুলিশ শাহনাজ এবং সোসাইটির বিখ্যাত ভদ্রলোক-মহিলার নগ্ন ছবি কোর্টে দেখিয়েছে। এগুলো মুস্তফা জায়েদীর পার্টিতে তোলা। চলচ্চিত্রের মুক্তিলাভে আমরা সন্দিহান।

অবশিষ্ট

ভূয়ো ভূমিকম্প

সমুদ্র গর্ভস্থ একটি ভূমিকম্প ইটালির সমুদ্রসৈকত শহর সাভোনা ধ্বংস করে দেবে—এই হচ্ছে গণকের গননা—প্রকাশিত হয়েছিল একটি জনপ্রিয় তথ্যপঞ্জীতে। সময়ের উল্লেখও গনক করেছিল : জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ, ১৯৭১। কিন্তু তৃতীয় সপ্তাহ আসার আগেই সাভোনাবাসীরা দলে দলে শহর ত্যাগ শুরু করে। এবং ক্রমশ: এই শহর ত্যাগের সংখ্যা এত ব্যাপক হতে থাকে যে শেষপর্যন্ত ইটালীর সরকার বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের এনে কেন এখন ভূমিকম্প হবে না তার ব্যাখ্যা রেডিও মারফত প্রচার করে। এতে বাস্তুত্যাগ কিছুটা রোধ হয়। এবং তৃতীয় সপ্তাহ দুর্ঘটনাহীনভাবে কেটে যাবার পর বাস্তুত্যাগীরা ফিরে আসতে থাকে। এসে অনেকে ভয়ে পালিয়ে যাবার কথা অস্বীকার করে বলে আত্মীয় বাড়ী গিয়েছিলাম বেড়াতে!

আবির্ভাব, নীল আকাশের নীচে, এতটুকু আশা, নাচের পুতুল কসম, উস ওয়াক্ত কী ইত্যাদি আরো কটা ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন স্বাতী খন্দকার। 'এখন অভিনয় করছিনা—সময় কম, তেমন চরিত্রও পাই না'। স্বাতী খন্দকার বললেন। কথা হচ্ছিলো অনুপমায় বসে। অনুপমা নিয়েই ব্যস্ত। অনুপমা মেয়েদের পোষাক তৈরীর দোকান—ছেলের অর্ডারও নেওয়া হচ্ছে। নতুন নতুন সার্ট বের করেন স্বাতী খন্দকার, কয়েকজন সহকারী রেখেছেন। অবস্থা দেখেই বোঝা গেল বেশ ভালই চলছে দোকানটা। 'অভিনয় ছাড়বো না' তিনি বললেন, 'তেমন চরিত্র পেলে অভিনয় করবো।' ফ্যাশনের বাজার সম্পর্কে বললেন, 'এখনো বেল বটম চলছে। তবে শিগ্‌গী লুঙ্গি-কামিজের রাজত্ব শুরু হবে।'

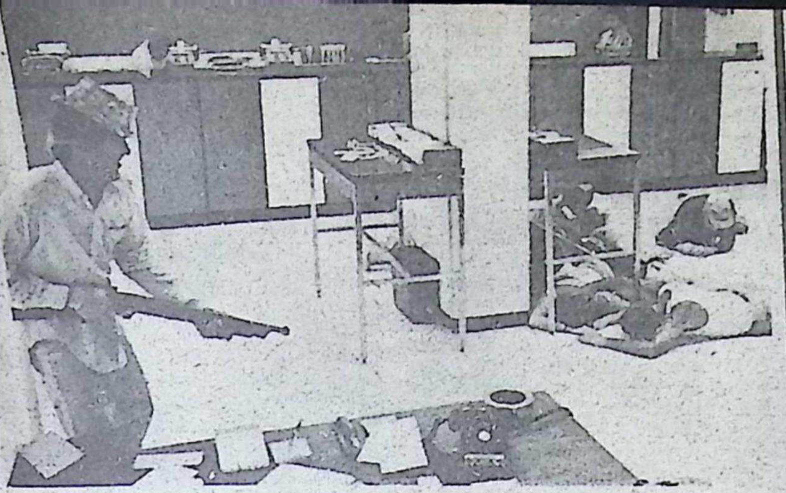

মিথ্যার মত সত্যি

ছবিটা দেখলে মনে হতে পারে এটা কোনো থ্রিলার ছবির দৃশ্য। আসলে কিন্তু তা নয়। থ্রিল আছে অবশ্য ঘটনাটিতে। এটি একটি ব্যাঙ্ক-ডাকাতির ছবি। ডাকাত ওই হ্যাট-পরিহিত রাইফেলধারী। তার অজান্তে ছবিটি তুলেছে একটি স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা। ঘটনাটি আমেরিকার।

যোগ অথবা বিয়োগ

মিলানের ৪৩ বছর বয়স্কা জনৈকা গৃহিনী বিউটি পারলারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করে বলেন যে, তিনি সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে পয়সা দিয়েছেন অথচ চিকিৎসার পর তাকে আরো কুৎসিত লাগছে। 'আপনার বয়স আমরা কমিয়ে দিতে পারি,' এই বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ হয়ে মহিলা উক্ত পারলারে গমন করেছিলেন। মহিলা এখন তার পুরানো বয়সটা ফেরত পাবেন কিনা জানা যায় নি।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী করাচীর হোটেল মেট্রোপোলে অনুষ্ঠিত সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় বিউটি কুইন নির্বাচিত হয়েছে মিস নিণ্ডা ওয়েব। বয়স ষোল। অনুষ্ঠান শেষে জনৈক হস্তরেখাবিদ মিস ওয়েবের হাত দেখে চলচ্চিত্রে নামার জন্যে পরামর্শ দেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রতিযোগিনীর বয়স ১৮ হতে হয়।

ক্রফোর্ড ও ল্যাসি

হলিউডের চলচ্চিত্র জগতে জোয়ান ক্রফোর্ড একটি বহুব্যবহৃত নাম। গত ৪৫ বছর ধরে তিনি একটানা ছবিতে অভিনয় করে চলেছেন। তার সঙ্গে যে কুকুরটিকে দেখা যাচ্ছে তার নাম—ল্যাসি। ল্যাসি গত ১৭ বছর যাবত টিভি নাটকে অভিনয় করে চলেছে। আমাদের দেশের টিভি দর্শকদের কাছে ল্যাসি একটি অতিপরিচিত নাম। ছবিটির উপলক্ষ্য : সম্প্রতি এরা দুজনাই যুক্তরাষ্ট্রের বহুখ্যাত বেনরুস সাইটেশান পুরস্কার লাভ করেছেন—দীর্ঘকাল যাবত মানুষের আনন্দবিধানের জন্য।

দাদী এলিজাবেথ টেলর

যৌবনবতী এলিজাবেথ টেলর আগামী আগষ্ট মাসে দাদী হবেন। নিজের আঠারো বছর বয়স্ক পুত্র মাইকেল ওয়েলডিং জুনিয়ার ও নববিবাহিতা স্ত্রী বেথ এ ঘোষণা দিয়েছে। ৩৯ বছর বয়স্কা লিজ ও তার নব উত্তরণে খুশী প্রকাশ করেছেন।

কিং ডেভিড ও পিপিং টম

ইসরাইলের বন্দর শহর হাইফায় এক পিপিং-টম গ্রেফতার করা হয় যখন সে একটি মেয়ের ঘরে উঁকি দিয়ে কাপড় ছাড়া দেখছিল। পিপিং-টম পুলিশকে বলে সে কিং ডেভিডের মত প্রেমে পড়তে চায়। কিং ডেভিড বাথশেবাকে দেখেছিল নগ্ন স্নান করতে। পুলিশ ছেলেটিকে ছেড়ে দেয়।

সোনার দাম এখন আগুন—কিন্তু ফ্যাশানের জগতে নতুন বছরে অনেক নতুন ডিজাইন এসেছে। এই বিদেশিনী তারই একটি নমুনা দেখাচ্ছেন।

চে নয় ৭৩/১৯৭০

জার্মানীর একটি শহর। নাম এরডিং। এই শহরের এক দম্পতি হেম্প-জর্জ ও মারিয়া ট্রেজ তাদের নবজাত সন্তানের নাম তালিকাভুক্ত করতে গিয়ে সম্প্রতি এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হন।

সেখানে ভারপ্রাপ্ত এক আমলা তাদের জানালেন, গত সাতাশ বছরের চাকুরী জীবনে তিনি 'চে' নামটি একবারের জন্যও শোনেননি। তিনি জানালেন, আর্জেন্টিনাতে চে বলতে, 'কে তুমি ?' বোঝায়। তা ছাড়া, এতে নাম ব্যবহারকারী ছেলে না মেয়ে তা-ও বোঝার কোনো উপায় থাকে না। তাই তিনি আইনত নামটি তালিকাভুক্ত করতে পারেন না।

নবজাতকের পিতামাতা আমলার এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলেন না। তারা ব্যাপারটির সুমীমাংসার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হলেন। আদালতে নবজাতকের পিতা হেম্প-জর্জ বললেন, 'আমি সর্বপ্রকার আদর্শবাদের বিরোধী। চে একজন মানুষ হিসাবে আমাদের প্রভাবিত করেছেন। চে এমন একটি লোক ছিলেন যিনি সর্বহারাদের মুক্তির জন্য যাবতীয় জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছিলেন। এ জন্য এমন কি তিনি শেষপর্যন্ত নিজের জীবন বিসর্জন দেন।'

বাভারিয়ার জনৈক রেজিষ্ট্রার হেম্প-জর্জের ছেলের নাম তালিকাভুক্ত করে নিয়েছেন। কিন্তু দুটি নিম্ন আদালতের রায় জর্জ দম্পতির বিরুদ্ধে গেছে। এ কারণে, উচ্চ আদালতের রায় না বের হওয়া পর্যন্ত চে মিথায়েল আপাতত এরডিং-এর সরকারী নথিপত্রে উল্লেখিত নম্বর ৭৩/১৯৭০—এইভাবে পরিচিত হতে থাকবে।

জেন ফণ্ডার নতুন উত্তেজনা

জেন ফণ্ডা ও রজার ভাদিমের বিয়েটা টিকলো না। ডিভোর্স না হলেও ভাদিম পরবর্তী বিয়ে সম্পর্কে বলেছেন, আর অভিনেত্রী বিয়ে করছি না। ভাদিমের এর আগের আরো তিন জন স্ত্রী ছিল বি, বি, আনেৎ, দানিউভ অভিনেত্রীত্রয়কে বিয়ে করেছিলেন। ফণ্ডা তার চতুর্থ পত্নী। ফণ্ডা সম্পর্কে তার শেষ মত হচ্ছে, জেনি হঠাৎ বদলে গেছে, সে এখন নতুন উত্তেজনা খুঁজছে—রাজনীতির ভেতর।

বা পাশের ছবির দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমাদের সুন্দরী মডেল বসন্ত ঋতুকে হৃদয়ের মাধুরী দিয়ে আহ্বান জানাতে কি অপরূপ সাজে সজ্জিতা হয়েছেন। বড় বড় ফুল ছাপ করা এ উজ্জ্বল বর্ণের শাড়ী তার সাজসজ্জার বৈশিষ্ট্যও বাড়িয়ে তুলেছে নাকি।

পাশের ছবিতে আমাদের মডেল পরেছেন উজ্জ্বল হলুদ কটকি শাড়ী। বসন্তে এ রঙ অত্যন্ত উপযুক্ত। সূতি শাড়ীতে বাসন্তী রঙ খোলে ভালো। এতে যদি নক্সা থাকে তবে বৈচিত্রে আরও অপরূপ হয়ে উঠ-তে পারে। বসন্ত ঋতুতেএখন ফ্যাশন হয়েছে খাদি শাড়ী। লাল পেড়ে বাসন্তী খাদি এঋতুতে ফ্যাশনের প্রথম কথা। আপনার কি আছে এমন একখানি শাড়ী?

অন্তরঙ্গ স্টুডিও

'জাত' কথাটাকে 'শিল্প' মতই নানা অর্থে ব্যবহার করা যায়। যেমন ভারী শিল্প, চলচ্চিত্র শিল্প, শিল্পকলা, তেমনি শিল্পজাত, শিল্পীর জাত, জাত শিল্পী। শিল্পীর জাত কথাটা আবার আপেক্ষিক : শিল্পীর জাতটা...ইত্যাদি এবং শিল্পীর জাত নেই। প্রথম বাক্যের পরবর্তী উহ্য শব্দটির উপর নির্ভর করে এরা ভাবের। দ্বিতীয় বাক্যটির অর্থ স্বভাবতই শিল্পী জাতি ধর্মের উর্দ্ধে। কিন্তু এই 'আন্তর্জাতিক' অর্থ ছাড়াও আরেকটা অর্থ কু-জনে করে। তা হল : শিল্পী জাত হীন, বজ্জাত অর্থে কি?

শিল্পী শিল্প এবং জাত নিয়ে আলোচনা করলাম একুশের কথা স্মরণ করে। বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্রকে ইণ্ডাস্ট্রী এবং আর্ট দুভাগে ভাগ করে না, বলা হয় চলচ্চিত্র শিল্প। 'এক ঢিলে দুই পাখি...'। কিন্তু আমি পড়েছি সমস্যায়। চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রী কলাকুশলী কোন অর্থে শিল্পী? ইণ্ডাস্ট্রী অর্থে শিল্পের, না আর্ট অর্থের শিল্পের? অন্য দেশের কথা আমার জিজ্ঞাস্য নয়। ঢাকার শিল্পীদের আমরা কি বলবো—শিল্পজাত দ্রব্য, অথবা জাত-হীন শুধু শিল্পী?

পাঠক, প্রিয় পাঠিকা, চিত্রিতার বয়স মাত্র ছ'মাস। আপনারা এক বছর আগের মার্চ সংখ্যার কোন চলচ্চিত্র পত্রিকা খুলে দেখুন। দেখবেন একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে শিল্পীরা শহীদ মিনারে গিয়ে বে-ইজ্জত হয়েছেন। ঘৃনা প্রকাশ করেছে সবাই। এ পবিত্র দিনে সবাই শহীদ মিনারে যায়, সবারই যাবার অধিকার আছে। কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পীদের দেখে অতি খুশীতে অপমান করেছেন ভক্তেরা। এ অপ্রিয় ঘটনাটা মনে করিয়ে দেবার কারণ এবারে একুশে ফেব্রুয়ারীতে এফ,ডি,সি ষ্টুডিওতে শহীদ মিনার নির্মাণের সঙ্গে এর একটা যোগসূত্র আছে। একুশে ফেব্রুয়ারী এবার শিল্পীরা একান্তভাবে পালন করবে—যাকে সাধারণ লোকের নোংরা মানসিকতার সমুচিত জবাব বলেই ধরে নেওয়া যেত। যেত বলছি এজন্যে যে, গত একুশে ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে আটটায় শহীদ মিনার উদ্বোধন উপলক্ষে এসেছিলেন সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার এবং আশেপাশের লোকজন। আসেননি শুধু চলচ্চিত্রশিল্পীরা।

কেন আসেননি এ প্রশ্ন করার মত বালখিল্যতা আমার নেই। ব্যক্তি স্বাধীনতা, এবং ইচ্ছা অনিচ্ছাকে আমি সম্মান করতে চেষ্টা করি। এ দিনটিতে সকাল বেলা ফুল হাতে বেরুতেই হবে এ সিদ্ধান্তে আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া কারো সর্দ্দি থাকতে পারে, কারো টনসিল ফুলতে পারে, কারো রাতে অনিদ্রা হতে পারে। এই নিয়মিত উপসর্গ একুশের দিনেই বা অন্য রকম হবে কেন?

একুশের সকালে এফ ডি সি প্রাঙ্গনে এসেছিলেন : জহির রায়হান, ই, আর খান, আনোয়ার হোসেন, শিবলী সাদিক রাজ আর হাতে গোনা কয়েকজন। অভিনেত্রীদের ভেতর বিখ্যাত কেউ (যাদের একুশের বাণী কাগজে ছাপা হয়েছে) আসেননি—এসেছিলেন একটি মাত্র মেয়ে, নাম রুপসী। দু'একটা ছবিতে একেবারেই নগন্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তার একুশের বাণী কোন কাগজ ছাপেনি বলেই হয়তো এক গুচ্ছ ফুল নিয়ে হাজির হয়ে ছিলেন ষ্টুডিওতে।

পাঠক কি বলবেন, শিল্পীর শুধু যে জাত নেই তা নয় সংস্কারও নেই। সংস্কারের, উর্দ্ধে উঠতে পারাটাও কম গৌরবের নয়।

❋

'ভালবাসা কারে বলে?' শাবানার নিশিত চিন্তা

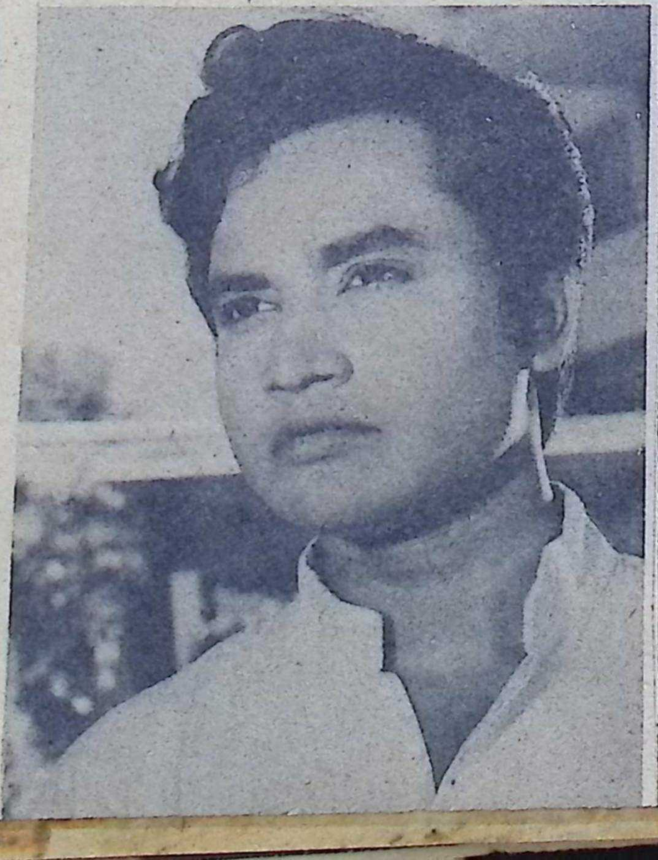

শাবানা 'সেকি কেবলি যাতনাময়!' উজ্জল

পরিচালক আকবর কবীর পিন্টু তার ছবি পলাশের রং-এর সেট ফেলে বসেছেন ২ নম্বর ফ্লোরে। আকবর কবীরকে পিন্টু নামেই মানায় ভাল। ছোট খাট মানুষ, মনে হয় এখনো রেঁস্তোরাতে বসে এক কাপ চা নিয়ে টেবিল চাপড়ে গল্প করেন। অথচ সেটে ক্যামেরার পেছনে বেশ জাঁকিয়েই বসেছেন। এ ছবির প্রযোজক নায়ক আজিম সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাকে ছোট ভাই হিসাবে। আজিম আমার পাড়াতুতো ভাই। পিণ্টু আবার আজিম এর মামাতো ভাই।

সেটে সেদিন ছিলেন আজিম সুচন্দা ও আলতাফ। ক্যামেরাম্যান মবিন আলত্যফ (ডাক্তার) এবং আজিমের একটা শট নিচ্ছিলা। ক্যামেরাম্যান মবিন আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমাদের কৈশোরোত্তর দিনগুলো এক সঙ্গে কেটেছে। মনে আছে ওদের সেই জয়-কালী মন্দির রোডের বাড়ীর ছোট পড়ার ঘরটার কথা।। ওদের পাশের বাড়ীতে থাকতো রবীন ঘোষ ও শবনম। সে সময় আমাদের ভাবনা চলচ্চিত্রকেন্দ্রিক ছিল না। কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিন মাস বসে থাকার সময় মবিনের মাথায় খেললো পত্রিকা বের করবে। পত্রিকা মানেই সিনেমা পত্রিকা। সত্যি সত্যি ডিক্লেরেশন নিয়ে পত্রিকা বের করা হল—মবিন সম্পাদক। পত্রিকার নাম, 'রং বেরং'। আমি ওতে কয়েকটা ফিচার লিখতাম এবং নামে বেনামে গল্প। ও পত্রিকার সহকারী সম্পাদক অথবা প্রকাশক ছিল, সঙ্গীত পরিচালক আনোয়ার পারভেজ। ছাপা হত ইত্তেফাক প্রেস থেকে। এখান ওখান থেকে ব্লক ধার করে পাঁচ ছয় সংখ্যা বের করার পর বন্ধ হয়ে যায় রং বেরং। মবিন তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র। কিন্তু একদিন সব গুটিয়ে ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট কেটে

ভারতের ভেতর দিয়ে যাত্রা করলো লাহোর, ইচ্ছে ক্যামেরাম্যান হতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান রিয়াজ বোখারীর (বানজারান) সঙ্গে কথা হয়েছে ওকে সহকারী করে নেবে। ঢাকায় মবিন তাকে অনেক তেল দিয়েছিল, সাহায্য করেছিল,—শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল কিন্তু পকেটে কয়েকটা কয়েকটা টাকা আর দেড় হাজার মাইল ট্রেনজার্নির ক্লান্তি নিয়ে লাহোরে এসে দেখল—রিয়াজ বোখারী এখানে অন্য মানুষ। হ্যাঁ, চিনলেন ঠিকই। কিন্তু তিনি শীতল ভাব দেখালেন।

কিন্তু মবিন ঢাকা ফিরে আসেনি। করাচীতে গিয়ে ইষ্টার্ণ ষ্টুডিওতে ঢুকে পড়লো। তারপর...

মবিনের গোঁফ জোড়া বেশ পুরুষ্ট হয়ে উঠেছে। করাচী থাকার ফলই বলতে পারেন, তবে এখনকার নয়, পঞ্চাশ বছর আগের। পঞ্চাশ বছর আগে যে বাঙ্গালী কবি করাচী গিয়েছিলেন হাবিলদার হিসাবে তিনি কবিতা লিখলেও গোঁফ জোড়া ঠিকই বাগিয়েছিলেন—হাবিলদারের মতই। হ্যাঁ, কবি নজরুলের কথাই বলছি। কবির গোঁফ আর মবিনের গোঁফের সম্পর্ক কি? ওটা আসলে হাবিলদার কবিরই গোঁফ। পূর্ব পাকিস্তান (আমাদের পূর্ব বাঙলা) সরকারের প্রচার দফতরের তৈরী বিদ্রোহী কবি নামে রঙ্গিন প্রামান্য ছবিটির ক্যামেরাম্যান ছিল মবিন। এ ছবিতে বালক নজরুল পাওয়া গেল, কবি নজরুল ও পাওয়া গেল কিন্তু সৈনিক নজরুল পাওয়া গেল না। পরিচালক তখন মবিনের মিনি গোঁফটাকে মিডি করার নির্দেশ দিলেন। দেখা গেল মবিনকে বেশ হাবিলদার হাবিলদার লাগে। কবি নজরুলের মডেল দিতে গিয়ে সেই যে গোঁফ রাখলো তারপর ওটার উপর মায়া পড়ে গেছে। ছাড়তে পারে নি।

মবিন আমার বন্ধু বলেই এতটা লিখলাম এটা ঠিক নয়। একজন অভিনেতা, একজন সাংবাদিক, একজন ক্যামেরাম্যানের পরিচয় করিয়া দিলাম। মবিনের আরেকটা গুণ আছে, সেটা হচ্ছে ও একজন ভাল অরগ্যানাইজার। এক সময় কচি-কাঁচার মেলার কেন্দ্রীয় পরিষদের আহ্বায়ক ছিল।

পবিচালক ই আর খানের সহকারী চুন্নু ওরফে বাসারও কচিকাঁচার মেলার পুরাণো কর্মি। পরিচালক সেদিন ছিলেন না, চুন্নুই দাগী ছবির ডাবিং করছিল। শিল্পী মিনু রহমান ও জহিরুল হক। নায়িকা নবাগত মিনু নামে হাসি খুশী মেয়েটি। নায়ক জহিরুল হক। নবাগত? আজ্ঞে না। পুরাণো পাপী। সংলাপ লেখেন, চিত্রনাট্য ও লেখেন। এবং অভিনয় করেন। তাকে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন টিভিতে—এখন সংশপ্তকে অভিনয় করেছেন। যে দৃশ্যটি ডাবিং হচ্ছিলো: ওমর চিন্তি পায়চারী করছে একটা ব্রিজের উপর।...পেছনের চাল থেকে উঠে এল মিনু রহমান।...নির্বাক ছবি দেখে বুঝলাম ওমর দেরীর জন্যে অভিমান করেছে। মিনু তার মান ভাঙ্গাতে চাচ্ছে। এটা বুঝতে ভাষা লাগে না— চিরন্তন ব্যাপার।

...ওমরের চোখে বিস্ময়। অসহায় ভাব...আবার রিপিট হচ্ছে দৃশ্যটা। কেউ বললো, রোলিং।

সাউণ্ড বুমটা নেমে এল। মিনু রহমান বললো, বাব্বা-রাগ হয়েছে···জানো, আমার ভাবীর না ছেলে হয়েছে।

সর্বনাশ—বললো জহিরুল হক, এতদিন ছিল ভাবী ভাবী। তার আবার ছেলে। সোদের ওপর বিষপোড়া।

দাগী ছবিতে নায়কের ভূমিকায়

কবিতা এ ছবির পর পুরোপুরি নায়িকা হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করবেন? ✻ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা

জ্ঞান হারালো নাকি? মুস্তফা দেখছে কবিতাকে। কমেডিয়ান সাইফুদ্দিন কি করবেন বুঝে পাচ্ছেন না।

✻ জ্ঞান হারিয়েছে রোজী। ভিলেন তুলিপই কি এর জন্যে দায়ী? বিষণ্ণ রাজ্জাক, মিরনা জামান। মানুষের মন ছবিতে।

প্রিয় প্রতীক্ষায় সুচন্দা

আজিম

পলাশের রঙ ছবিতে পরিচালক আকবর কবির অভিনয় করছেন ওমর। কণ্ঠ জহিরুল হক। অবশ্যি পরিচালক ই আর খান বললেন, ওমরের কণ্ঠও রেকর্ড করবো। যেটা ভাল লাগবে সেটাই চালাবো।

দাগীর যেটুকু দেখেছি তা থেকে ওমর সম্পর্কে আমার আশাবাদ অনেক বেড়ে গেছে। সহজ অভিনয় করেন। সুদর্শন তো বটেই। নবাগত মিনু রহমানের মিষ্টি কণ্ঠস্বর, অভিনয় সুন্দর। মুখশ্রী শ্রী-মণ্ডিত। তবে শরীরটা সম্পর্কে যত্নশীল হতে হবে। একটি গানের দৃশ্যে ওমর ও মিনু নবাগত হিসাবে রীতি মত দুঃসাহস দেখিয়েছেন।

এক নম্বর ফ্লোরে কদিন ধরে সমাধানের সমাপ্তি পর্বের কাজ চললো। পরিচালক আজিজ আহমেদের প্রথম ছবি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুক্তি দিতে আগ্রহী। আজিজ আহমেদ ও করাচী ফেরত। ওখানে অনেক ছবির কাহিনী লিখেছেন। পেশাগত দিক থেকে আবার কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট।...সমাধানের সেটে সেদিন ছিলেন শাবানা ও রোজী।

কান্নাকাটির দৃশ্য। শাবানা বাড়ীর মেয়ে, রোজী কাজ করে। শাবানাকে রোজী খেতে বলছেন—শাবানা কান্নায় ফেটে পড়ে বলবেন, তুই যা, আমাকে একা থাকতে দে।

কিন্তু রোজী আর শাবানা নিজেদের ভেতর কি এক কথা নিয়ে হেসেই হুটোহুটি। পরিচালক ওদের সামনে মনিটারের নির্দেশ ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুজন গম্ভীর। মনিটর হল। আবার হাসি...।

সুচন্দা

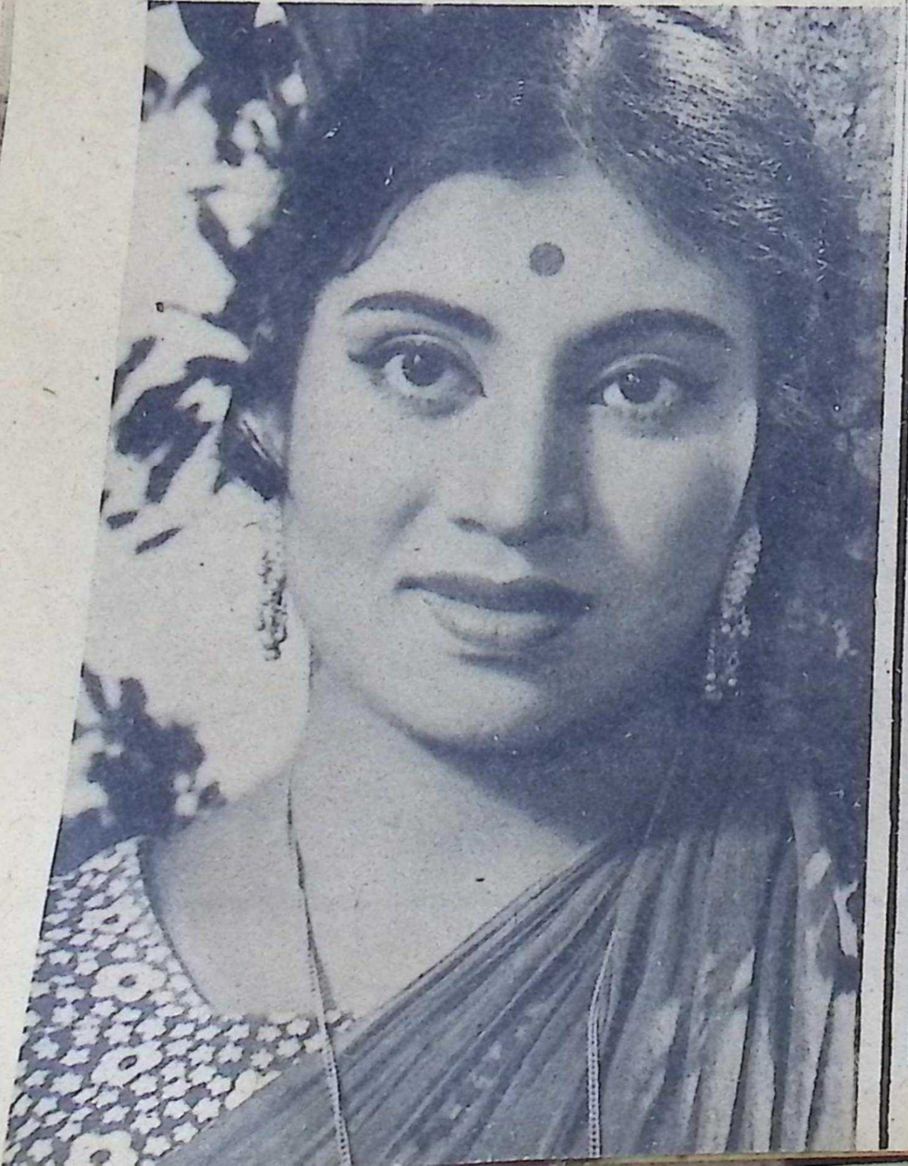

দ্বিধা নারায়ন চক্রবর্তীর। বেবী জামানের প্রশ্ন। নিরুত্তর সুলতানা। ছদ্মবেশী রাজ্জাক হাসে। নুরুল হকের প্রতিশোধ।

ষ্টুডিও মহলে আমি নবাগত। সবার সঙ্গে যেচে পরিচিত হই। শাবানার সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সহকর্মিরা যা ভয় দেখালো তাতে আর কাছে ভিড়তে সাহস হয় না। ভয় শাবানাকে নয়। ভয় ওর পিতাজীকে। পত্রিকার লোকের সঙ্গে মেয়ে কথা বললে উনি নাকি ক্ষেপে যান। কথাটা সত্যি না ও হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখার সাহস এখনো সংগ্রহ করতে পারিনি।

লেট দেয়ার বি লাইটের কাজ এগিয়ে চলছে। সেদিন জহির রায়হান চার ঘণ্টা ধরে লাইট ঠিক করে একটি দৃশ্য টেক করলেন: ঘুম থেকে জেগে ববিতা কড়িকাঠ দেখতে দেখতে আপন মনে হাসব। লাইট ঠিক করা হচ্ছিল। ববিতা একভাবে বসে ছিল বিছানায়। হাঁটুতে জড়ানো বেগুনি চাদরটা। ওটা দিয়ে হাঁটুর লজ্জা ঢাকেন। 'টেকের' সময় ওটাকে অপসারণ করা হয়।

জহির রায়হানের বর্তমান হবি হচ্ছে রাজনীতি। এককালে রাজনীতি করতেন —ছাত্র রাজনীতি। সেই অতীতের স্মৃতির জাবর কেটে অনেকদিন কাটিয়ে আবার সচ্চারে রাজনীতির কথা ভাবছেন। তার জীবনদর্শন পালটে গেছে। এক সময় কিছুকে ভয় করতেন না। যা ইচ্ছে হতো করতেন। তারপর সমাজ আর পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে চাইলেন। 'একজন চড় মারলে হাসতেই চেষ্টা করছি।' পরিচালক রায়হান বলেন, 'এখন চেষ্টা করবো চড় ফিরিয়ে দিতে দ্বিগুণভাবে।' সেই আগেকার দিনের মত। আগের শক্তি ছিল তারুণ্য। এখনকার শক্তি কি? হয়তো এই সমাজ, এই এখনকার অবস্থা। সবাই এখন উত্তেজিত, সবাই এখন টেনশনে ভুগছে, সবাই কেটে পড়তে চাইছে। প্রাক্তন রাজনৈতিক কর্মী জহির রায়হান যে চাইবেন তাতে আশ্চর্য কি?

'আমি হান্নার ষ্টাইক করবো—'

এই টেনশনের কথা যখন লিখছি রাস্তায় যাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের মিছিল। সামনে বসে কৌতুক অভিনেতা কে, কুমার। সহকর্মির সঙ্গে কথা বলতে বলতে কথাটা বললেন। টেনশনে আছেন এ ভদ্রলোকও। ছবিতে কাজ চান, পান না কাজের জন্যে কৌতুক অভিনেতা হান্গার ষ্টাইক করতে চান এফ ডি সির অথবা শেখ মুজিবের বাড়ীর সামনে। 'বাংলা ছবিতে কাজ চাই।' সহকর্মী উর্দুতে প্রশ্ন করলো, আপনার বাংলা বলতে অসুবিধা হয় না?'

'কি আশ্চর্য কথা'—বাংলায় বললেন কে, কুমার 'বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছি আগে। এখন কাজ চাইলেই বলে, 'কুমার ভাই, একটা মুদীর দোকান দাও, এসব ছেড়ে' কিন্তু ভাই মুদীর ব্যবসা আমি পারি না।'

এটা ইণ্ডাষ্ট্রী অর্থে শিল্প। এটা আর্ট অর্থেও শিল্প। কিন্তু কোন অর্থেই মুদী দোকান না। কিন্তু জীবন যে শিল্পের চেয়ে মুদী দোকানকেই চায়। ইণ্ডাষ্ট্রী বড় বড় ম্যাগনেটদেব প্রভাইড করে, এশিল্প জাত ও মানে না। কিন্তু কে কুমারকে মুদি দোকান দিতে হবে কেন?

ববিতা কাপড়ের দোকানে কাজ করে। ক্রেতাদের দেখায় শাড়ীটা পরলে কেমন দেখাবে। ছবির নাম মানুষের মন। পরিচালক মুস্তফা মাহমুদ।

'লেট দেয়ার বি লাইট ছবিতে ববিতা

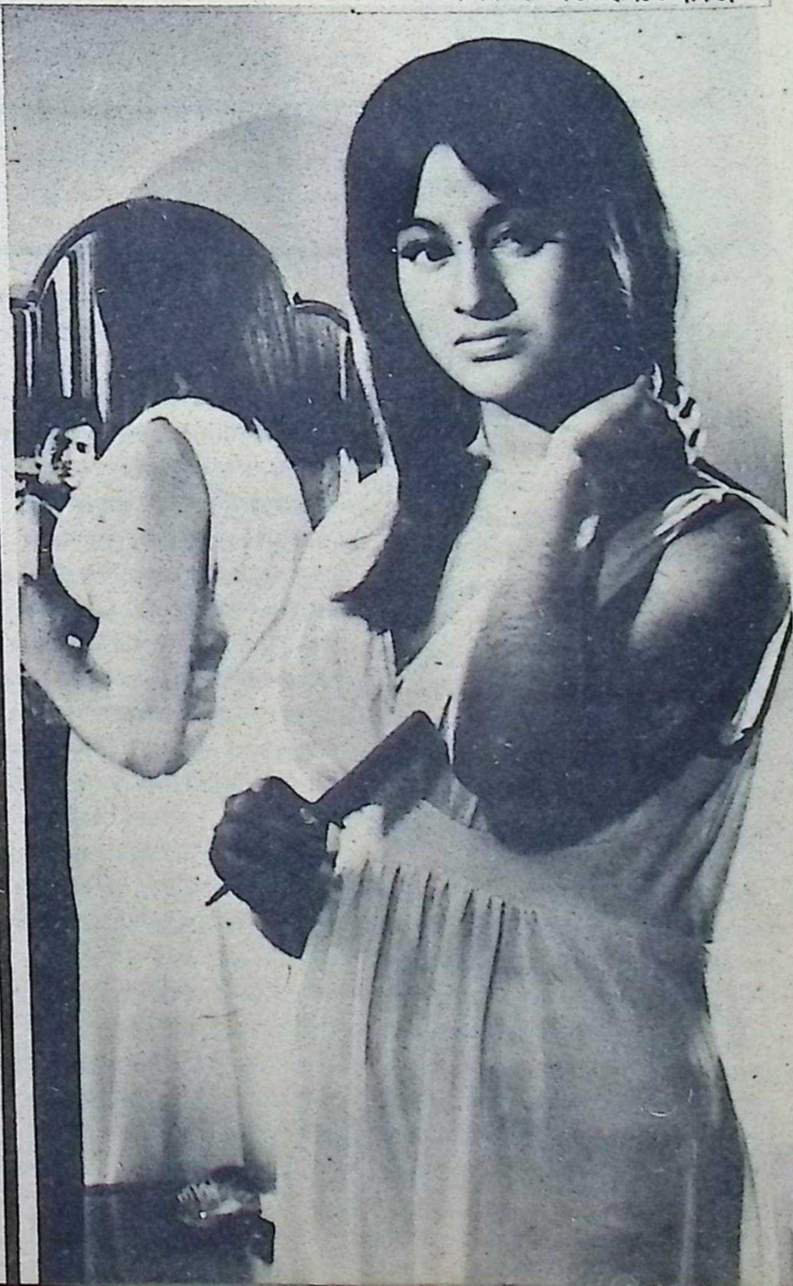

লোকটা একের পর একজনকে পথে বসাচ্ছে। রহস্যজনক লোকটা কি চায়? সুচন্দার প্রশ্ন। লোকটা রাজ্জাক।

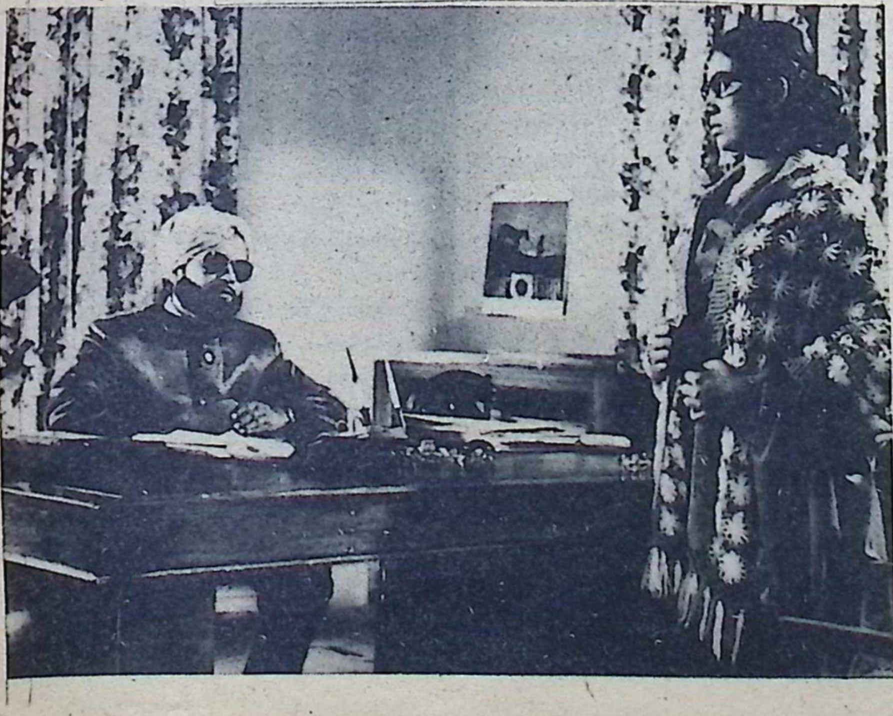

আমি জীবনের মোহের কাছে পরাজিত

মুনীর চৌধুরী

প্রশ্ন—১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল? সে আন্দোলনে আপনার ভূমিকা সম্পর্কে আমরা বিশদ জানতে চাচ্ছি।

উ: ১৯৫২ সালে পুলিশ যখন প্রথম গুলিবর্ষণ করে সে সময় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক। গুলী চলবার কিছুক্ষণ আগে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান মেডিকেল সেণ্টারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। নির্জন রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে মেডিকেল কলেজ ছেড়ে আসবার একটু পরেই পুলিশ এসে আমাকে বাধা দেয় ও লাঠি দিয়ে আঘাত করে সাইকেলের উপর থেকে ফেলে দেয়। এর কয়েক মিনিট পরেই গুলী হয়। গুলী হয়ে যাবার পরের দুদিন।

আমিও মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ঘোরাঘুরি করছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠিত করবার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ কত শক্তিশালী করা যায় সেটাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু আমরা তা পারিনি। চব্বিশে ফেব্রুয়ারী রাতের বেলা পুলিশ আমার তৎকালীন বাড়ী ঘেরাও করে আমাকে গ্রেফতার করে। একই সময়ে ড: পৃথ্বিশ চক্রবর্তী, মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী ও অজিত গুহকেও গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘ দুবছর পর আমরা ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসবার পর মুক্তি লাভ করি। অবিশ্যি জেলের অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম নয়। এর আগে আমি ১৯৪৯ সালের ৩রা মার্চ রেলধর্মঘট সংগঠিত করার অপরাধে গ্রেফতার হয়েছিলাম। অবিশ্যি এর পেছনে একটা কারণ রয়েছে। তা হলো সে সময় আমি কমুনিষ্ট পার্টির সদস্য হিসেবে শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলাম।

প্র:—ভাষা আন্দোলনের সময় বাঙলা দেশের মানুষ আপনাকে একজন অনমনীয় দৃঢ় বলিষ্ঠ বিপ্লবী বলে মনে করতেন। পরবর্তীকালে আপনি নিজেকে সেই ভূমিকা থেকে নির্বাসিত করে অন্যতর জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন কেন?

উ:—এ প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। যে সাহসিকতা এবং যে নি:স্বার্থ পরায়ণতা দেশের জন্য কাজ করার শক্তি ছাত্র বয়সে ছিলো পরবর্তীকালে তা হারিয়েছি। প্রধান কারণ হলো রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের মত গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিল না। তাছাড়া আমরা যে জীবনদর্শনে বিশ্বাস করতাম তার বাস্তবায়নের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিলনা। জানতাম এটা সুদূরবর্তী—এ দর্শন প্রতিষ্ঠিত করতে সময় লাগবে। সে সময় দুর্জয় সাহসী না হলে বিশেষ করে মুসলমানদের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগদান করা অসম্ভব ব্যাপার ছিলো। এর জন্যে প্রয়োজন সংগঠিত চিন্তা এবং কঠিনতম আত্মত্যাগ। তাছাড়া আমার ভেতরে প্রথম হতেই

দুটো দ্বন্দ্ব কাজ করেছে। এক সময়ে চেয়েছিলাম দেশের জন্য সারাজীবন কাজ করব—অন্য সময় মনে হতো আমি প্রচুর লিখব। ছাত্রজীবন শেষ হবার পর কমুনিষ্ট পার্টি একটা মারাত্মক রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রম করেছিল। সেসময়ে আমি বুঝেছি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এসেছে—এবং যে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিনা কেন তাকে হতে হবে গুরুতর সিদ্ধান্ত। অবশেষে আমি লেখার কাজকেই বেছে নিলাম এমনও সময় গেছে যখন পঞ্চাশ টাকার চাকুরীর জন্য পত্রিকা অফিসে ঘুরেছি। অনেকেই বিনে পয়সায় কাজ করিয়ে নিয়েছে কিন্তু পয়সা দেয়নি। এরপর মানসিকতা পালটেছে, আমার শ্রেণী উত্তরণ হয়েছে যার জন্যেও লিখতে পারিনি, ওদের জীবনকে উপলব্ধি করতে পারিনি। ওদের কাছ থেকে দূরে সরে এসেছি বলেই আমার লেখা জনগণের জন্য হয়নি। এসবই আমার অজুহাত। আসল কথা হচ্ছে আমি জীবনের মোহের কাছে হেরে গেছি।

প্র:—পাকিস্তান লেখক সংঘকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর বেশ কিছু সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। আপনি কি মনে করেন এসব পুরস্কার সত্যিকার অর্থে সাহিত্য এবং সাহিত্যকর্মীকে পরিণত সৃষ্টিশীলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?

উ: আমি যে সৃষ্টিশীলতায় বিশ্বাস করি। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এ ধরনের পুরস্কার তার সহায়ক হতে পারে না। যে কোন শ্রেণীর সাহিত্যিকের রচনা তার বিপরীত শক্তিকে আনন্দ দেবে না। মধ্যবিত্ত সমাজের লেখকের রচনা দেশের বৃহত্তর অংশ শ্রমিক ও কৃষকসমাজকে আনন্দ দেবেনা। উচ্চ মধ্যবিত্ত বা শ্রেণীর যে লেখক লিখবেন তার রচনা কখনো, দু:খী মানুষ যারা সমাজ সংগঠনের মহৎ কর্মে যুক্ত, তার প্রতিফলন হবে না অথবা যাদের অর্থে পুরস্কার দেয়া হয় তাদের শ্রেণী বিরোধীও হবেনা। লেখক মনের অজান্তে হলেও লোভের পথে পা বাড়াবেন। এদেশে যে সব সাহিত্য পুরস্কার প্রচলিত আছে অর্থপ্রাপ্তি ছাড়া এর কোন মূল্য নেই। লোকেও একে সম্মান দেয় না। আমি অবিশ্যি সাহিত্য পুরস্কারের বিরোধী নই। তবে এতে বিপদের সম্ভাবনা বেশী। লেখকরা নিজের অজান্তে হলেও চাইবেন লেখায় এমন কিছু না আসুক যাতে সমাজপতিরা রুষ্ট হয়। এ চিন্তা ব্যাপক হলে সাহিত্যের ভয়ানক ক্ষতি হয়—আমাদের সাহিত্য তাই সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। আমাদের সাহিত্য সবচে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ডিকেডী আমলে। ডিকেডি আমলে লেখকদের জন্য প্রচুর জাগতিক সুখের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এদেশে সাহিত্যের রাষ্ট্রিয় ও সংঘীয় পুরস্কার অরাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যাবহৃত হচ্ছে এমন কথা ভাববার কারণ নেই।

প্র:—বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যকে যথাযথ সামাজিক মূল্য দিতে হলে, যথাযথ সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে কি কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত? এব্যাপারে আপনি কোনো গঠনমূলক প্রস্তাব দিতে পারেন কি?

উ:—এ প্রশ্নের জবাব অনেক সহজ ব্যাপার। বাঙলা ভাষাকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমার মতে কতগুলো সরকারী নির্দেশনাই যথেষ্ট। বাঙলা ভাষা অফিস আদালতে ও শিক্ষাগত পর্যাপয়ে প্রচলনের প্রস্তুতি নেই। এটা অজুহাত মাত্র। যাজ নির্দেশ জারী হলে কাল থেকেই সর্বক্ষেত্রে বাঙলা ভাষার ব্যবহার শুরু হয়ে যাবে। তবুও আমার মনে হয় বাঙালীরাই বাঙলা ভাষার প্রচলনকে আটক রেখেছে। আমাদের মধ্যে আমাদের বিরোধীশক্তি এত প্রবল যে আমরা হেরে যাই। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে শিক্ষিত বাঙালী। বাঙালী জ্ঞানের নামে ইংরেজী চালু রেখেছে। পণ্ডিত ও শিক্ষিত মহলে বাঙলা প্রচলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সবচেয়ে বেশী। কারণ ওদের সব অজুহাত ভ্রান্ত। তাই পণ্ডিতদের শায়েস্তা করা দরকার।

প্র:—বাঙলা ভাষা আন্দোলনের সাফল্য রাজনৈতিক দিক থেকে বাঙলা ভাষাভাষী মানুষের অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করছে বলে কি আপনি মনে করেন?

উ:—নিশ্চয়ই।এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কারণ ভাষা ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা সমগ্র প্রকাশের চিহ্ন। সে সময়কার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাই ভাষা আন্দোলনে ইন্ধন জুগিয়েছে। বাঙালী অন্য ভাবে সন্তুষ্ট থাকলে ভাষা আন্দোলন এত ব্যাপক হতোনা—এটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম বহি:প্রকাশ। এ আন্দোলন হচ্ছে স্বাধীনতার প্রতীক-আন্দোলন। সেদিনের সেই প্রস্তুতি তাই আজ অনেক সাফল্য অর্জন করেছে।

প্র:—আপনি কি মনে করেন এদেশে বাঙলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ঔদার্য উপস্থিত?

উ:—না, আমি এ পরিবেশ ও সৃষ্টি সম্পর্কে আশাবাদী নই। এ জন্যে আমরা দায়ী। কারণ এখানে সাহিত্যে কলাগত সাফল্য এসেছে কিন্তু এদেশের সাহিত্যিকরা সমাজ সংগঠনের চিন্তা থেকে দু:খজনকভাবে বিচ্ছিন্ন।

রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে আজও জবাব পাওয়া যায় নি।

আশরাফ সিদ্দিকী

পরিচালক কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড

প্র:—আপনি কি মনে করেন কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙলা ভাষা-ভাষীরা উপকৃত হয়েছেন ?

উ:—স্পষ্টত: বলতে গেলে এর জবাব হ্যাঁ। এমন এক সময় ছিলো যখন এদেশে বিজ্ঞান অথবা মানববিদ্যার উচ্চমানের বই বাজারে পাওয়া যেতোনা। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও মূলত: বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম সুরু হয়েছে ১৯৬৪ সাল থেকে। এর পর থেকে বোর্ড মৌলিক বই প্রকাশের ও শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ে সমুদয় মাতৃভাষার প্রয়োগের ব্যাপারে করণীয় কার্যাবলীর উপর কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ পর্যন্ত বোর্ডের আর্থানুকূল্যে ৮০টি বই প্রকাশিত হয়েছে। উচ্চতর পর্যায়ে মাতৃভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যাবশকীয় পরিভাষার ক্ষেত্রে বোর্ড উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। এ পর্যন্ত ৭০০০ শব্দের পরিভাষার কাজ হয়েছে। এ ছাড়াও বোর্ডের সহযোগিতায় ১৬টি বই প্রকাশ করেছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বোর্ড ১২টি থিসিস বাঙলায় প্রকাশের জন্য অর্থ সাহায্য করেছে। যেসব শিশু পত্রিকা ও সংগঠনকে বোর্ড নিয়মিত অর্থ সাহায্য দিয়ে আসছে বোর্ডের সাহায্য না পেলে তাদের কাজ কতটুকু সমাধা হতো তা বলা যায় না। বাঙলা ভাষায় ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে বোর্ড যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে তা হলো বাঙলা টাইরাইপটাইরের সংস্করণ। জটিল বাঙলা টাইরাইপটারে সংস্করণের ফলে এখন যুক্ত অক্ষর লেখা যাবে। এ সংস্করণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। বোর্ড উন্নত সংস্করণের পাঁচটি নমুনা টাইপরাইটার আমদানী করেছে। অফিস আদালতে নথিপত্র বাঙলায় লিখবার নমুনা বোর্ড প্রকাশ করেছে। এর প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

প্র:—অনেকের অভিযোগ বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড সাহিত্য সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান নয়। প্রতিষ্ঠানটি এ ক্ষেত্রে শুধু সরকারী দায়িত্বই পালন করে চলেছে। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি ?

উ:—বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড মূলত: গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান। আমরা যদি সভা সমিতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে পারতাম তাহলে বোর্ডকে সক্রিয় মনে হতো। কিন্তু তাহলে বোর্ডের সত্যিকার উদ্দেশ্য ও আদর্শ ব্যাহত হতো। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে মাতৃভাষাকে উচ্চতর পর্যায়ে প্রয়োগ করা। এ দায়িত্ব পালন করা পর্যন্ত অন্য কাজে হাত দেয়া সম্ভব নয়। এ দায়িত্ব অনেক গুরুদায়িত্ব। মাতৃভাষাকে উচ্চতর পর্যায়ে প্রয়োগ করতে পারলেই আমরা খুশী হবো।

প্র:—বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডকে আরও সক্রিয় এবং আরও জীবন্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার কোনো বাস্তব পরিকল্পনা কি আপনার হাতে রয়েছে ?

উ:—আমাদের হাতে যে পরিকল্পনা রয়েছে তা বাস্তবায়িত করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু অর্থ নৈতিক সীমাবদ্ধতার জন্য নতুন পরিকল্পনা হাতে নেয়া সম্ভব হচ্ছেনা। আমরা আমাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ৮০ লক্ষ টাকা দাবী করেছি, কিন্তু সরকার ৪০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। সরকারী সাহায্য লাভ করা দীর্ঘসূত্রতার ব্যাপার। আমরা যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করি না কেন তা বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হয়, কেননা বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান।

প্র:—বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড কোন কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারলে আপনি খুশি হবেন ?

উ:—আমি সবচেয়ে আনন্দিত হবো যদি বোর্ড ডিগ্রী পর্যায়ে অন্তত: একটি করে বই দিতে পারে। আমি আরো সুখী হবো যদি অফিস আদালতের সর্বক্ষেত্রে বাঙলাকে চালু করতে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পারি। আমাদের আরেকটা লক্ষ্য রয়েছে—তা হলো বোর্ডের ভবনকে কোন উন্মুক্ত জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং একে শিল্পী সাহিত্যিকদের মিলনক্ষেত্র করে তোলা। বোর্ডকে এমনভাবে সাজিয়ে দেয়া যাতে ভবিষ্যত কর্মকর্তাদের কোন অসুবিধে পেতে না হয়। আমি মনে করি তাহলেই শহীদদের স্মৃতির প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান জানানো হবে। একুশের ফেব্রুয়ারীর ব্যাপ্তি আমাদের সমগ্র জীবনে। বাইশে ফেব্রুয়ারীতেই কেন আমরা শহীদদের ভুলে যাবো ?

প্র:—বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো তার কি হলো ?

উ:—রবীন্দ্রচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত বোর্ডের গভর্নিং বডির গত বছরের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। প্রচলিত নিয়মনুযায়ী আমরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রকাশের অনুমতির জন্য গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আজো কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

প্র:—এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেসব ভারতীয় বই পাঠ্য রয়েছে তার আমদানীর ব্যাপারে যে বিধিনিষেধ রয়েছে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ?

উ:—এ সব বই পূর্ব বাঙলায় ছাপানোর ব্যবস্থা করা দরকার। এর জন্যে প্রয়োজন হলে অনুমতি নেওয়া দরকার। জ্ঞানের রাজ্যে যোগাযোগ উন্মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

প্র:—পাকিস্তানী সংস্কৃতির যে কথা বলা হয়ে থাকে সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

উ:—সংস্কৃতি ভৌগলিক এবং ঐতিহাসিক। আঞ্চলিক ভিত্তিতে সংস্কৃতিকে বিকশিত হতে দেওয়া উচিত। সংস্কৃতি হচ্ছে নদীর মতো—একে বাধতে গেলে আবর্ত তৈরী হবে। সংস্কৃতি চলিষ্ণু, স্থানু নয়। পাকিস্তানের আঞ্চলিক সংস্কৃতির সুষম বিকাশের মধ্য দিয়েই পাকিস্তানী সংস্কৃতির জন্ম হতে পারে। অন্য কোন উপায়ে নয়।

প্র:—আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আপনি রবীন্দ্র বিরোধী বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আপনার বলবার কিছু আছে কি ?

উ:—এ ঘটনা আমার জীবনের সবচেয়ে দু:খজনক ঘটনা। আমি কল্পনাও করতে পারিনি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের ছাত্র হয়ে আমার নাম রবীন্দ্রবিরোধী বিবৃতিতে ছাপা হবে। এটা ডিকেডী আনন্দের ষড়যন্ত্রের বহি:প্রকাশ। আমি কখনোই রবীন্দ্রবিরোধী নই, এধরণের কোন প্রমাণ কেউ হাজির করতে পারবেনা। রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়ে কোন প্রশ্ন হতে পারে না।

প্র:—বর্ণ সংস্কারের যে প্রস্তাব এসেছিল সে সম্পর্কে কিছু বলবেন কি ?

উ:—বর্ণ সংস্কারের কোন প্রয়োজন নেই। ভাষার নিজস্ব গতিতেই বর্ণ সংস্কার হবে। আমরা জোর করে কোন কিছু করতে গেলে আগামীদিনের বাঙলা ভাষাভাষীরা রবীন্দ্রনাথ-নজরুল পড়তে পারবেনা। প্রাচীন থেকে বিচ্ছিন্ন ও ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত হবে আমাদের বংশধরেরা। কোন ভাষার বর্ণ সংস্কার ঐতিহাসিক ব্যাপার। বর্ণসংস্কার করতে হয় না, আপনা আপনি হয়।

প্র:—বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মে সরকারী আধিপত্য এবং প্রভাব কতটুকু ?

উ:—বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। সরকার কখনো এর কার্যে হস্তক্ষেপ করেননি। প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে গভর্নিং বডিই সর্বোচ্চ সংস্থা। বোর্ডের গভর্নিং বডির যারা সদস্য তারা অবিশ্যি সরকার মনোনীত ব্যক্তি, তথাপি এরা সবাই স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন।

চিত্রিতা সাক্ষাৎকার

একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে চিত্রিতা প্রতিনিধি ভাষা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষার সঙ্গে জড়িত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহন করেছে।

কবীর চৌধুরী

পরিচালক, বাঙলা একাডেমী

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন বাংলা ভাষা আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে বাঙলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাঙলা ভাষা-ভাষীরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন? যদি হয়ে থাকে কিভাবে, কেমন করে হয়েছেন?

উত্তর : বাঙলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠার ফলেবাঙলা ভাষাভাষীরা উপকৃত হয়েছেন। এর প্রতিষ্ঠা মানুষের চেতনা বা অনভূতির জগতকে উৎসাহিত করেছে। বাঙলা ভাষাভাষী পাঠক, গবেষক, অনুবাদক, বাঙলাভাষা শিক্ষার্থী বিদেশী—সবাই উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করেছেন। বিশেষ করে অবহেলিত লোকসাহিত্যকে সংগ্রহ করে মধ্যযুগীয় চেতনা থেকে নতুন আলোকে উজ্জীবিত করেছে এবং গবেষকদের জন্য অমূল্য ভাণ্ডার সৃষ্টি করেছে। চিরায়ত বিদেশী সাহিত্য অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাঙলাভাষাভাষীদের কাছে বিশ্ব-সাহিত্যের ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করেছে। এ পর্যন্ত বাঙলা একাডেমী একশো খানা অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন জগত যেমনি কথা-সাহিত্য, কবিতা, রাজনীতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকের একশোখানা পাণ্ডুলিপি প্রকাশিতব্য রয়েছে। শুধু এসবই নয়, বাঙলা একাডেমী তার গবেষণা বিভাগে লোকশিল্পের একটি যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছে। এতে লোকসংস্কৃতির বিচিত্র নমুনার প্রায় দুশো পঞ্চাশটি নমুনা সংরক্ষিত হয়েছে। এরূপ সংরক্ষণ হয়তো পূর্ববাঙলায় একক। একইভাবে আমরা লোকসঙ্গীত সংগ্রহেরও সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। মোট কথা আমাদের সীমিত শক্তির মধ্য দিয়ে বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির মূল্যায়নের যে চেষ্টা চালাচ্ছি তাতে বাঙলাভাষাভাষীরা উৎসাহ বোধ করছেন।

প্রঃ অনেকের অভিযোগ বাঙলা একাডেমী সাহিত্য সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে জীবন্ত প্রতিষ্ঠান নয়। প্রতিষ্ঠানটি এ ক্ষেত্রে শুধু অফিসিয়াল দায়িত্বই পালন করে চলেছে। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উঃ এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত নই। আমি বুঝতে পারছি বাঙলা একাডেমীর কাছে এ দেশের মানুষের যা প্রত্যাশা তাতে আমরা যদি অনবরত সভা-সমিতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাট্যানুষ্ঠান করতে পারতাম তাহলে বাঙলা একাডেমী আরো জীবন্ত বলে প্রতীয়মান হতো। আমরা যা করতে চাই তাতে আমাদের প্রচুর অর্থ ও লোক দরকার। কিন্তু বাঙলা একাডেমীর জন্য সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করেছেন তাতে কোন বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বাঙলা একাডেমীর বার্ষিক আয়ের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় চার লাখ টাকা। এর দুলাখ টাকা আসে প্রাদেশিক সরকার ও এক লাখ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হতে। বাকী একলক্ষ টাকা সদস্যদের চাঁদা ও বই বিক্রির অর্থ বাবদ আসে। অনেকে সদস্যদের চাঁদা বাড়ানোর কথা বলেছেন কিন্তু আমরা একমত হতে পারিনি। আমরা গত দু বছর যাবত সরকারের কাছে বিধিগত বরাদ্দ হিসেবে পাঁচ লাখ টাকা দাবী করে আসছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন জবাব পাইনি। আসল কথা হচ্ছে, বাঙলা একাডেমীর কাছে জনগনের যা প্রত্যাশা একমাত্র কোন জাতীয় একাডেমীর পক্ষেই তা পুরণ করা সম্ভব।

প্রঃ আপনারা কি বাঙলা একাডেমীকে জাতীয় একাডেমীতে রূপান্তরের দাবী তুলেছিলেন?

উঃ আমরা নিজেরা এ দাবী উত্থাপনের মধ্য দিয়ে কোন বিতর্কের মাঝে যেতে চাই না। আমরা মনে করি জনগনের পক্ষ হতে এ দাবী ওঠা উচিত। একমাত্র তখনই বাঙলা একাডেমী জাতীয় একাডেমীতে রূপান্তরিত হতে পারে।

প্রঃ আপনি কি মনে করেন এ পর্যন্ত বাঙলা একাডেমীর পুরস্কারগুলো যোগ্য ব্যক্তিদিগকেই প্রদান করা হয়েছে? এ পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা কিভাবে বিবেচনা করা হয়? আপনি কি মনে করেন এ পুরস্কারের আর্থিক পরিমাণ বাড়ানো উচিত?

উঃ এ প্রশ্নের জবাব দেয়া একটু কঠিন ব্যাপার। পুরস্কার সবসময়ই বিতর্কমূলক। পুরস্কার প্রবর্তনের প্রথমপর্বে হয়তো মানদণ্ডের ক্ষেত্রে একটুখানি শৈথিল্য ছিলো। তবে সেটা হয়েছে উৎসাহ দেবার জন্য। আমাদের একটা দুর্বলতা রয়েছে তা হলো আমরা এখন পর্যন্ত এমন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি যার ফলে যে বছর ভালো বই বেরুবেনা সেবছর কোন পুরস্কার দেয়া হবে না। একসময় পুরস্কারের ক্ষেত্রে একজন লেখকের বয়োজ্যেষ্ঠতা এবং সাধনা গুণ বলে বিবেচিত হতো। বর্তমানে সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষ গুণ বলে বিবেচিত হয়। আমি মনে করি পুরস্কারের পরিমাণ কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে যে পুরস্কার দেয়া হয় তা অসম্মানজনক।

প্রঃ সাহিত্যরসিক এবং সমালোচকদের অভিযোগ বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বইয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশীরমান অত্যন্ত নীচু স্তরের। আপনি কি এই অভিযোগ খণ্ডন করতে চান?

উঃ হয়তো বা হয়েছে। আমরা কাজ সঞ্চয় করে রাখতে চাই। যার জন্য আমরা তরুণ ও প্রবীণ সব ধরণের লেখকদের স্বাগত জানাই। এদের লেখা মনোনয়নের জন্যে আমাদের কমিটি রয়েছে। অনেক সময় বাইরের বিশেষজ্ঞের কাছেও পাঠানো হয়ে থাকে। সবসময়ই পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমরা একটা মানদণ্ড বজায় রাখবার চেষ্টা করি।

প্রঃ বাঙলা একাডেমীকে আরও সক্রিয় এবং আর জীবন্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার কোনো বাস্তব পরিকল্পনা কি আপনার হাতে রয়েছে?

উঃ আমাদের হাতে যে পরিকল্পনা রয়েছে তা বাস্তবায়নের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা। এর মধ্যে এবার আমরা একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে এক সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। আমরা একটা নিয়মিত সাহিত্য পত্রিকার কথা ভাবছি, তাছাড়া আগামী শীতে আমাদের একটা প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলন করবার ইচ্ছে আছে। এর বাইরে এ বছর আমরা ব্যাপক হারে সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবার আশা রাখি।

প্রঃ সমকালীন, বিশেষ করে তরুণ সাহিত্যগোষ্ঠি ও লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো বিশেষ চেষ্টা কি একাডেমী করছে?

উঃ এ ব্যাপারে একাডেমীর কোন সংঘবদ্ধ ব্যাপক পরিকল্পনা নেই। তবে আমরা সবসময়ই ছোট ছোট সাহিত্য পত্রিকা ও তরুণদের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে আসছি। এছাড়া আমাদের প্রাঙ্গনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সভাসমিতি করবার ব্যাপারে কোনো বাধা নেই।

প্রঃ বাঙলা একাডেমীর কর্মধারায় সরকারী আধিপত্য এবং প্রভাব কতটুকু? বিশদভাবে বলতে পারেন কি?

উঃ অতীতে কিছু থেকে থাকলেও বর্তমানে নেই। বর্তমানে একাডেমী স্বাধীনভাবে কাজ করছে।

'জনগণের পক্ষ থেকেই জাতীয় একাডেমী প্রতিষ্ঠার দাবী ওঠা উচিত।'

MD. AMIN CHOWDHURY

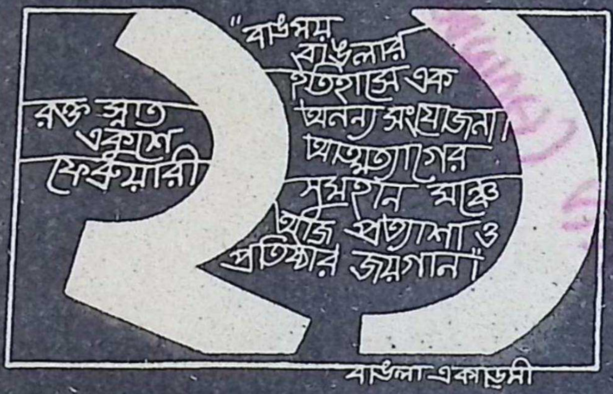

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অংগনে
বাঙলা একাডেমীর
অবদান ঃ

ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যে ৭১ খানা, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে ১২ খানা, লোক সাহিত্যে ২৪ খানা, নাটকে ৩৬ খানা, শিশু সাহিত্যে ৪৩ খানা, ইতিহাস ও জীবনীতে ৩০ খানা বিজ্ঞানে ১৮ খানা, সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে ৯ খানা, ধর্মীয় সাহিত্যে ১৮ খানা, দর্শনে ৮ খানা, বিবিধতে ৭৭ খানা, সর্বমোট ৩৪৬ খানা পুস্তক প্রকাশ করেছে।

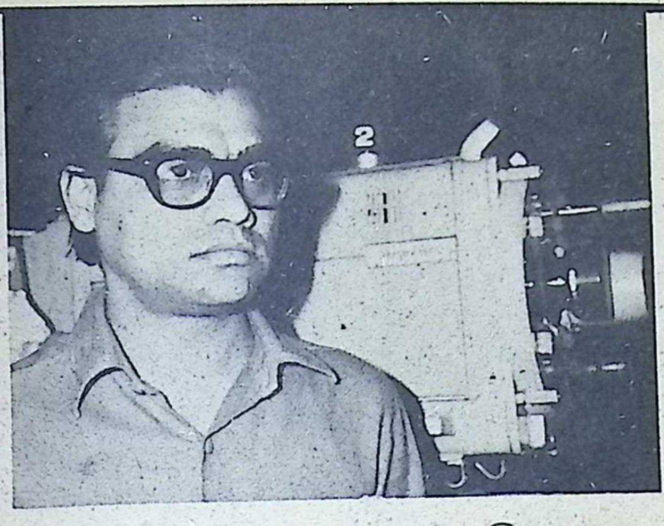

সংসপ্তক-এর প্রযোজক ও পরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুন

নির্বাচনেও প্রযোজকের সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়না। কোন কোনও শিল্পী নিয়মিত একাধিকবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন করছেন আবার কোনও শিল্পীর দীর্ঘ-দিনে একটির বেশী প্রোগ্রাম লাভের কোনও সুযোগই হচ্ছেনা। আবদুল হামিদ টেলিভিশনে প্রাণের প্রিয় শিল্পী বলেই অনুমতি হচ্ছে নইলে এত ঘন ঘন পর্দায় তার উপস্থিতি ঘটে কেন? অপর-পক্ষে শাহ নাজ বেগম, বেলা পারভীন প্রমুখ শিল্পীকে আজকাল বড় বিশেষ দেখাই যায় না। এর তুলনায় সাবীনা ইয়াসমীনকে আমরা ইদানীং খুব বেশী দেখতে পাচ্ছি না কি?

উল্লেখিত শিল্পীরা সবাই খ্যাতিমান ভালো শিল্পী এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু যত ভালো শিল্পীই হোন না কেন তাঁদের অনুষ্ঠানে বারবার উপস্থিত হতে দেখলে কোনও শ্রোতারই যে ভালে লাগতে পারে না তা বলাই বাহুল্য।

সঙ্গীতের অনুষ্ঠান একঘেয়ে না হোক মোটামুটি সুসামঞ্জস্যতা বজায় থাক শুধু এটুকুই আমাদের কাম্য। সঙ্গীত প্রযোজকেরা দয়া করে এদিকটায় একটু বিবেচনা করে দেখবেন কি?

টেলিভিশনের ঝিমিয়ে পড়া মহিলা অনুষ্ঠান আবার কিছুটা প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নতুন নতুন বিষয়ে মহিলাদের আলাপ-আলোচনার উপস্থাপনা মহিলা অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। মহিলা অনুষ্ঠানকে সজীব করে তুলবার জন্য খালেদা ফাহ্মীর এ উদ্যম নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে অনুষ্ঠান পরিচালনায় তিনি যদি আরও নতুন মুখ কিছু উপস্থিত করতে সক্ষম হন তবে সকলেরই ধন্যবাদার্হ হবেন এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে।

এদেশের চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে টেলিভিশনের মাঝে মধ্যে দু'একটি আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারিত হতে আমরা দেখেছি। তবে সবকটি অনুষ্ঠানে একই ব্যক্তির উপস্থিতি দেখে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারিনি। চলচ্চিত্র সম্পর্কে কিছু আলোচিত হলেই কি জহির রায়হান, খান আতাউর রহমান, প্রমুখ অতিপরিচিত এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিদের উপস্থিত করতেই হবে? এদের বাইরে এদেশে আর কি কোনও ব্যক্তিত্ব নেই যারা এ বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করতে পারেন?

আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করে আসছি যে ঢাকা টেলিভিশনে দীর্ঘদিন সাহিত্যের সত্যিকার কোন অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছেনা। টেলিভিশনের ত্রৈমাসিক অনুষ্ঠানসূচীতেও সাহিত্যের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত নেই বলে আমাদের আশঙ্কা। টেলিভিশনে কোন সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা প্রচারিত হয় না, পুস্তক সমালোচনার অনুষ্ঠানটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সাহিত্য অনুষ্ঠান বলতে যদি কিছু প্রচারিত হয়ে থাকে তবে তা সারিবদ্ধ কিছু উদীয়মান তরুণ কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠের মধ্যেই সীমায়িত। কি কারণে টেলিভিশনে সাহিত্য অনুষ্ঠানের সমাধি ঘটেছে আমাদের বোধগম্য নয়। প্রতি আকস্মিক এ বিরাগ দর্শকদের শুধু বিস্মিতই করেনি, বিক্ষুব্ধ ও করে তুলেছে। সাহিত্যের প্রতি টেলিভিশনের এ বিতৃষ্ণা কতদিন বজায় থাকবে আমরা জানতে পারলে বাধিত হতাম।

পরিশেষে টেলিভিশনের ঘোষণার ঢং দেখে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে ঘোষণার সময়, তাদের শরীর যেখানেই থাক মনটা বুঝি দেহের বাইরেই মুক্ত বিহঙ্গের মত বিচরণ করে বেড়ায়। নইলে ঘোষণায় এত ভুল শুনবার দুর্ভাগ্য শ্রোতাদের এতদিনই হবে কেন। টিভির সবেধন নীলমনি পুরুষ ঘোষকের কণ্ঠস্বর, অভিব্যক্তি অথবা উচ্চারণ কোনটাই দর্শকদের ইমপ্রেস করতে পারেনি ও পারছেনা, তবু কেন এ বিষয়ে টিভি কর্তৃপক্ষ সচেতন হচ্ছেন না তা তাঁরাই ভালো জানেন।

(২৪শে ফেব্রুয়ারী ৭১)

শুধু ঢাকা নয় সারা বিশ্বের টিভি দর্শকের কাছে লুসী সিরিজ অত্যন্ত জনপ্রিয়। ওপরের ছবিতে লুসী এবং তার মেয়ে ও ছেলেকে দেখা যাচ্ছে

প্রচ্ছদ ও রঙ্গীন ছবি মুদ্রণে
পদ্মা প্রিন্টার্স এণ্ড কালার লিমিটেড, ঢাকা

হারুন রশীদ কর্তৃক কথাকলি প্রিণ্টার্স, ৬৮/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নায়িকা ববিতা

প্রতি কপির মূল্য একটাকা মাত্র

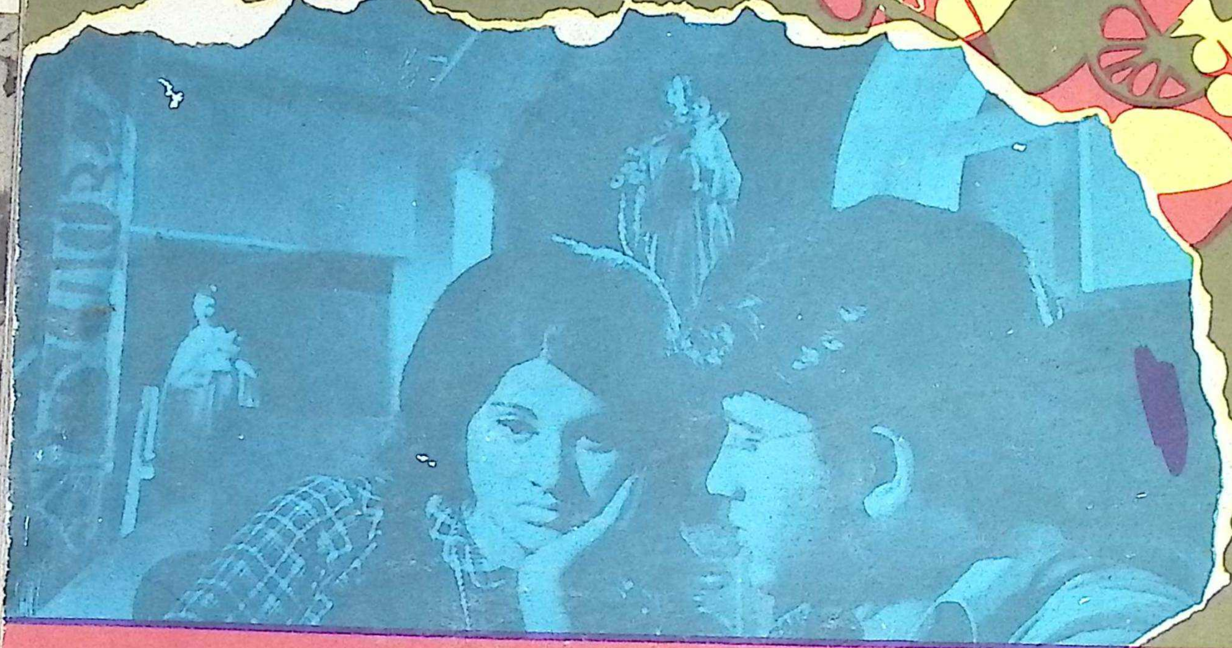

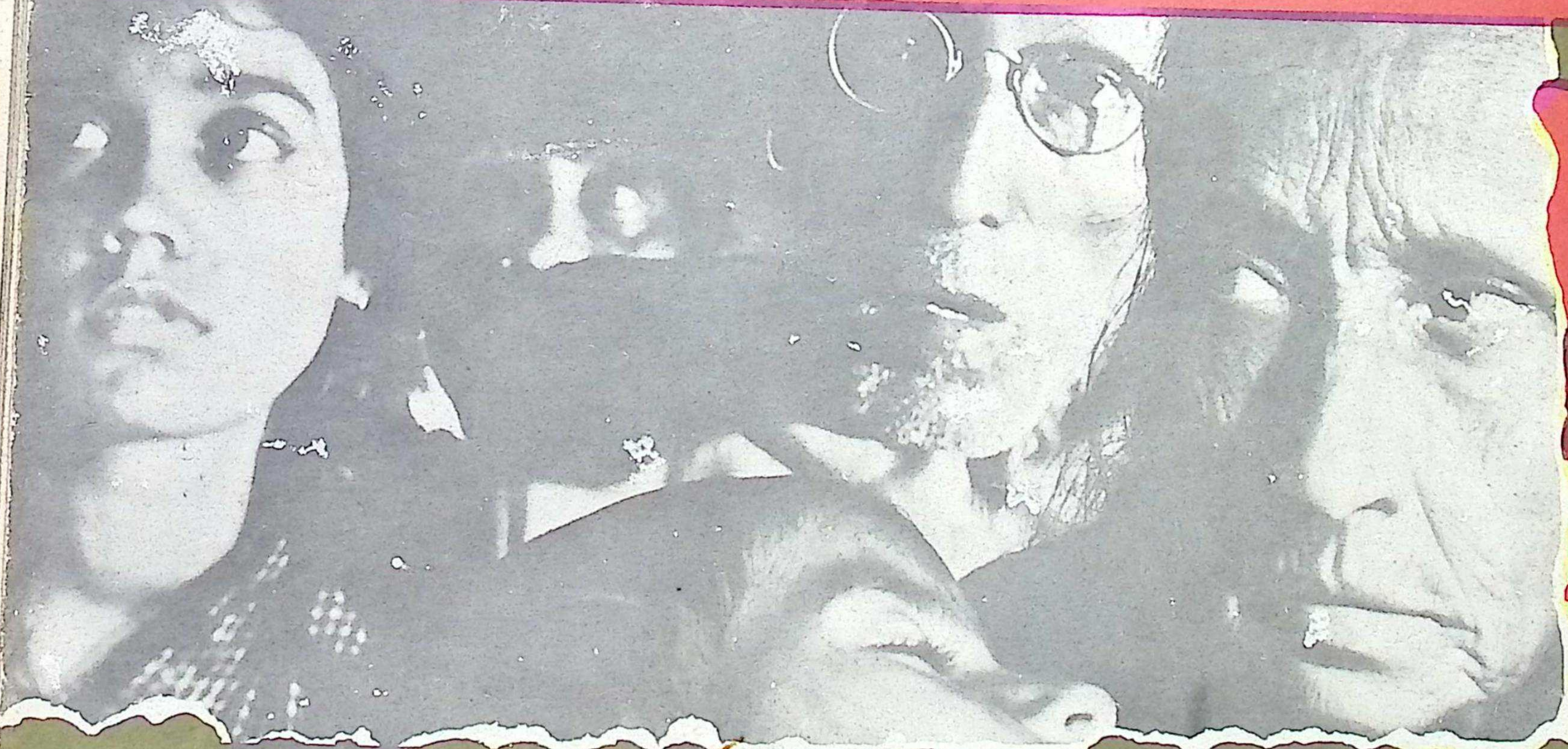

AN ODE TO HUMAN SUFFERINGS THROUGH THE AGES

ZAHIR RAIHAN'S

LET THERE BE LIGHT

BABITA

OMAR CHISTI

চ বি জাদুঘর আর্কাইভস
-১৫৪২-